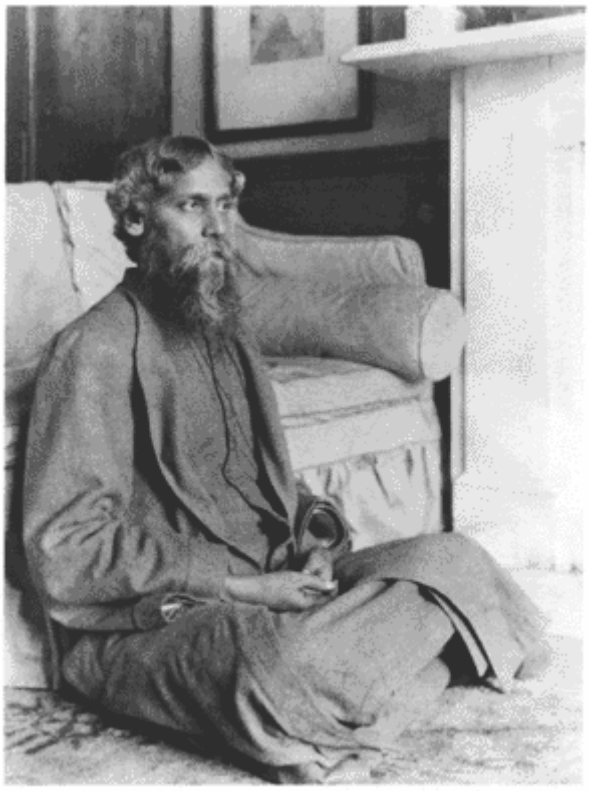

Photo courtesy of Sir John Rothenstein

Rabindranath Tagore, Hampstead, London, 1912

চির-নূতনেরে দিলো ডাক, পঁচিশে বৈশাখ

আবদুর রউফ চৌধুরী

সূচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পঁচিশে বৈশাখ ১২৬৮ বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে বাক্য সমাপ্ত করতে মন চায় না, বরং ভাবতে ভালো লাগে এ-দিন বারবার আসে– সোনার বাংলার শ্যামল গাঁয়ে, রূপালী-গাঙের জলে, বোলে-ভরা ডালের ছায়ে, বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বরে, রজনীগন্ধার গন্ধে, কোকিল-ডাকা আম্রকাননে। কবির ভাষায়,

জন্মদিন আসে বারে বারে
মনে করাবারে
এ জীবন নিত্যই নূতন
প্রতি প্রাতে আলোকিত
পুলকিত
দিনের মতন [...]।[১]

বাঙালি জীবনের খণ্ড, ছিন্ন, অপূর্ণ অনুভূতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আত্মা– নবদৃষ্টি ও নূতনভঙ্গির ছোঁয়ায় ও স্পর্শে– ক্ষুদ্রতার সীমা অতিক্রম করে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর স্পর্শে উদ্ভাসিত হয়েছে বাঙালি জীবনের নানা দিকদিগন্ত। কবির সৃষ্টিতে, তাঁর কবিমানসের যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় তা বাঙালি জীবনে বয়ে আনে বিশেষ সার্থকতা। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে বাংলার সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়ে কবি যে-ছবি, যে-রূপ, যে-রস, যে-সুন্দর, যে-সুধা সঞ্চয় করেছেন এই পরিপূর্ণ পাত্র থেকে উপচে পরা অমৃত পান করে আমরা, বারবার তাঁর জন্মদিনে, হই আলোকিত, হই পুলকিত। কবি তাঁর পরমসন্ধ্যালগ্ন পর্যন্ত ও বাংলার 'পরশ' পাওয়ার জন্য ছিলেন ব্যাকুল; তাঁর হৃদয়াত্মা ছিল যেমনি একদিকে বাংলার স্থলে-জলে, কাছে-দূরে, ছন্দে-সুরের স্পর্শ পাওয়ার জন্যে আকুলিত, আন্দোলিত তেমনি অন্যদিকে বাংলার চাঁদের আলো, ডিঙিতে মাঝির ভাটিয়ালি সুর, নৌকার গায়ে থেকে-থেকে ওঠা ঢেউয়ের শব্দ, সন্ধ্যার মেঘমালা, অযুত-নিযুতভাবে বয়ে যাওয়া জলতরঙ্গানুভূতির গূঢ় আনন্দধারায় আপ্লুত; তাই ত বাংলার দৃশ্যাবলী, গ্রামীণ ভূদৃশ্য ও পল্লীবাংলার শব্দমঞ্জরি তাঁর পঙক্তিমালায় এসেছে বারবার। বাংলার লীলাচাঞ্চল্য, আনন্দবেদনা, আবেগানুভব, দুঃখসন্তাপ, আশাযন্ত্রণা, দ্বন্দ্বসংগ্রাম অনুরণিত হয়েছে তাঁর অবিস্মরণীয় বীণার তারে, আর তা রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর শুদ্ধতম সৃষ্টিনিদর্শনে।

এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরসসরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা [...]।[২]

বাংলাদেশের সৌন্দর্য উপভোগ করে রবীন্দ্রনাথের মন হয়ে ওঠে প্রশান্ত, পরিতৃপ্ত, শান্তিময়; বাংলার মানুষ, সমাজ, পরিবেশ ও প্রকৃতির আকর্ষণে তাঁর আত্মা হয়ে ওঠে অতি আগ্রহী; এতে কোনও চঞ্চলতা নেই, অশান্তিও নয়। কবির প্রতিভাশক্তি অসাধারণ। বিচিত্র বাংলাদেশের রূপ যে মাধুরী নিয়ে কবির দৃষ্টিতে ধরা দেয় তা যেন এক নিবিড় মমতায় আচ্ছন্ন, আবদ্ধ। কবি তাঁর মাতৃভূমিকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবেসে কল্পনার তুলির রেখায় রূপমাধুরী দিয়ে বিচিত্র বাংলাদেশের ছবি এঁকেছেন, একমনে। যখনই বাংলাদেশ তার রূপসী অনুপমরূপ বিকশিত করে কবির চোখের সামনে তখনই রবীন্দ্রপ্রাণ মেতে ওঠে রূপালী নদীর সৌরভে, ফলে কবি গভীরভাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপ্রেমে আবদ্ধ হন; তাই ত পদ্মার স্রোতের তালে তালে গান গেয়ে চল্লিশটি বছর কাটিয়ে দেন, আর প্রকাশ করেন বাংলার অপ্রকাশিত বিচিত্র রূপটি।

[১] স্ফুলিঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[২] জন্মদিন, পরিশেষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার নৌকো বাঁধা ছিল পদ্মানদীর পারে,
হাঁসের পাঁতি উড়ে যেত মেঘের ধারে ধারে—
কী জানি সেই দিনগুলি সব কোন্ আঁকিয়ের লেখা,
ঝিলিমিকি সোনার রঙে হালকা তুলির রেখা [...] ।[৩]

আর

[...] ডাক দিয়েছিল পদ্মানদীর ধারা,
কাঁপন-লাগা বেনুর শিরে দেখেছে শুকতারা;
কাজল-কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে
নীল ছায়াটি বিছিয়েছিল তটের বনে বনে [...] ।[৪]

আমরা জানি তিনি জন্মেছিলেন জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে । এ কি তাঁর একমাত্র পরিচয়? না, তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন অন্যভাবে– ভিন্নরকম মন-মানসিকতায়– বাংলার নদী, মাটি, কীট, মানুষ, পল্লীবাংলা, একতারাকে ভালোবেসে,

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান,
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান ।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণ-তরুণী
তুলিল অশোক,
মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, 'এ আমাদের লোক ।'
আর কিছু নয়,
সে মোর প্রথম পরিচয় [...] ।[৫]

বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কালোত্তীর্ণ বিশাল অবস্থান । তিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতায় দেশ ও কালের উত্তরণ ঘটিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপভ্রংশ চেতনার মধ্যে এক সাবলীল নিদর্শন প্রথিতকরণের সার্বজনীন আস্থা অর্জন করেছেন, যে-কারণে রবীন্দ্রসৃষ্টিনিদর্শন এখন পর্যন্ত জীবন ও প্রকৃতির অমোঘ সম্মিলনে স্পষ্টভাবেই স্পর্শকাতর । তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনের পরিধি ব্যাপক । জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে কালের আবির্ভূত পরিবর্তনীয় ধারাসমুন্নয়ন-চেতনায় একদিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন হতে পেরেছেন জাগতিকভাবে বৈপ্লবিক, অন্যদিকে মননবৈশিষ্ট্যের নিগুঢ়তত্ত্ব বিশ্লেষণে বিলীন হওয়ার নিরাভরণ যোগ্যতা অর্জন করেছেন অতিন্দ্রিয়তাবাদী প্রজ্ঞাধারায়, এ-কারণেই রবীন্দ্রনাথকে চিরনূতন ধারাপ্রবাহে উপলব্ধি করা যায় বাংলার সবকিছুতে । বাংলার সবকিছুতে রবীন্দ্রনাথের সোনার পরশ লেগেই আছে, তাই বলা চলে তিনি বাংলার সর্বত্রে বিরাজমান; তিনি জাগতিক জীবনপ্রকৃতি-উত্তরিত স্রষ্টাপুরুষ; তিনি মননবৈশিষ্ট্যের মানসপ্রকৃতি-উত্তরিত প্রজ্ঞাপুরুষ । তাঁর কাছে বৈকুণ্ঠের চেয়েও কাম্য হয়ে ওঠে বাংলার নদী, মাটি, কীট, মানুষ, পল্লীবাংলা, একতারা– এসবের মধ্যেই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়; পাওয়া যায় তাঁর সারা জীবনের সার্থক সৃষ্টিনিদর্শনে, যা নানাভাবে সমৃদ্ধ চেতনায় ঋদ্ধ করেছে দেশ-কাল পেরিয়ে বিশ্বগণ্ডির নানা আয়োজন । বাংলার নদী, মাটি, কীট, মানুষ, পল্লীবাংলা, একতারা কীভাবে রবীন্দ্রসৃষ্টিনিদর্শন ফুটে উঠেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার বাসনায় এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি গাঁথার চেষ্টা করেছি ।

[৩] পদ্মায়, ছড়ার ছবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৪] জন্মদিন, সেঁজুতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৫] সেঁজুতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

নদী

বাংলার প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের দেহমনকে প্রবলভাবে অধিকার করে নিয়েছে, তাই ত কবি বলেছেন যে, বাংলার 'তারাময়' আকাশের নীচে তিনি কী আবার জন্মগ্রহণ করবেন! যদি করেন তবে যেন বাংলাদেশের নিস্তব্ধ গোরাই নদীর একটি সুন্দর কোণে নিশ্চিন্তমুগ্ধ মনে পড়ে থাকতে পারেন– যেখানে সন্ধ্যার সুগভীর ভালোবাসা নিস্তব্ধভাবে ছড়িয়ে থাকবে তাঁর বুকের উপর।[৬] এখানে লক্ষণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলার রূপ ও স্বরূপের প্রথম প্রকাশ ঘটিয়েছেন নদীর মাধ্যমে; এখানে– রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিনিদর্শনে– তিনি চতুরস্র, সহজ, সাবলীল। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রায়োজনিক ও প্রায়োগিক দিকসমূহ নিয়ে কবি ভেবেছেন সুগভীরভাবে, তাই তিনি উপহার দিয়েছেন বাংলাসাহিত্যে (সমালোচনা সাহিত্যসহ) এক শালীনতার আর্দশ ও নান্দনিক রসবোধ। তাঁর পক্ষে এসব করা সম্ভব হয়, কারণ তিনি প্রেরণাস্থল হিশেবে বেছে নিয়েছেন বাংলার নদী (অবশ্য মাটিও)– যেখানে সবকিছুই সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ, আলোকিত, উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কন, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। কবির কাছে– বর্ষার নদী যখন 'পরিপূর্ণতার শেষরেখা পর্যন্ত' উদ্দামচাঞ্চল্যে ভরপুর, আত্মহারা তখন প্রকৃতি-মা 'উদ্বিগ্ন'। নদীতীরের অর্ধনিমগ্ন কাশতৃণলতাবন, সরসসঘন আখের ক্ষেত ও দূরদিগন্তে 'নীলাঞ্জনবর্ণ' বনোরেখা– সব যেন এক 'রূপকথার সোনার কাঠি'র ছোঁয়ায় জেগে ওঠা 'নবীন সৌন্দর্য', যা সহজে ও মুগ্ধভাবে পরিস্ফুটিত।[৭] রবীন্দ্রনাথ ছোট-বড় সব নদী দিয়েই চলাফেরা করেছেন, এমনকী পদ্মার জলের ওপর ভেসে বেড়িয়ে পদ্মার 'বালুচরের মধ্যে' শুনতে পেয়েছেন 'চকাচকীর কলরব', 'কোকিলের কুহুতান'; যেখানে পঞ্চম, মধ্যম, কড়িকোমলের কোনও সুর না থাকলেও ছিল 'পদ্মাচরের গান'; সেখানে ছিল শীতের রোদ্রের হাওয়ায় অসংখ্য প্রাণীর জীবনসুখসম্ভোগের আনন্দধ্বনি।[৮]

> ও [পদ্মা] স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়—
> তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
> বিশুদ্ধ তার আভিজাতিক ছন্দে
> এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর-এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।[৯]

পদ্মা সুপ্রাচীন, প্রচণ্ড-পবিত্র-প্রসিদ্ধ-সম্ভ্রান্ত নদী; কোনওদিকে তার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই– সে স্বতন্ত্র, তার ক্ষুদ্রতার নাগালের বাইরে চলার গতি, তার হারানোর কিছু নেই, সে অদম্য স্রোতে ভরপুর। পদ্মার শক্তি প্রচণ্ড– পথ সম্মুখে যা পায় চূর্ণ করে দেয়, কেউ বাঁধা দিতে পারে না, দিলে মানেও না। পদ্মার দ্বিধা নেই, মমতা নেই, ভেঙে দেয় সব বাঁধন, সে বাঁধাবন্ধনহীন– কী ভাঙছে, কী রক্ষা করছে তার দেখার সময় নেই, নির্মম সম্রাজ্ঞীর রীতিই যেন তার। পদ্মার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-প্রগাঢ় ভালোবাসা সে-প্রগাঢ় ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে তিনি পদ্মাতীরে বসবাস শুরু করেন, আর তখনই তাঁকে আপ্লুত করে পদ্মার পাশের আম-জাম-ঝাউবেত-সর্ষে ক্ষেত, ফাল্গুনের মৃদুমধুর সুগন্ধে ভরা বাতাস, নির্জন চরে কলধ্বনিমুখরিত বুনোহাঁস, সন্ধ্যা-তারায় জ্বলজ্বল-করা স্রোতের স্বচ্ছলতা। তাঁকে এসবই পদ্মার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তায় আবদ্ধ করে।[১০] একথাও সত্য যে, 'পদ্মাতীরের নিরালা আবাস'টি কবিকে তাঁর সৃষ্টিনিদর্শন সৃষ্টিতে সাহায্য করে, এজন্যই তিনি বলেছেন যে, একদিন পদ্মা নদীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ 'যোগাযোগ' ছিল। পদ্মার জন্ম হিমালয়ে আর বঙ্গোপসাগরে গিয়ে তার শেষ। পদ্মার সৃষ্টি প্রাত্যহিক জীবন থেকে বহুদূরে, প্রাত্যহিক জীবন থেকে বিস্তৃত তার পরিণাম, দৈনন্দিন জীবন থেকে দূরত্বে তার চলার গতি– স্বতন্ত্র আভিজাত্য গরিমায় যার জন্ম সে কী করে পারে আভিজাত্যের কথা ভুলে থাকতে! সে লোকালয়ের পাশ দিয়ে বয়ে চললেও তার ছন্দ আলাদা, লোকালয়কে সহ্য করে কিন্তু স্বীকার করে না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিনিদর্শন সাধনার পথটিও গৃহস্থের

[৬] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৭] অতিথি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৮] বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৯] কোপাই, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১০] বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুখদুঃখের পাশ দিয়ে বয়ে চললেও দূরত্ব অবশ্যি বজায় রেখেছে, স্বতন্ত্রভাবে। আর আভিজাত্যের প্রশ্নে– পদ্মাতীরের জীবনযাত্রা যদিও রবীন্দ্রসৃষ্টিনিদর্শনে স্থান পেয়েছে তবুও আভিজাতিক ছন্দের ব্যবধান কবিকে পৃথক করে রেখেছে নিভৃতে, সকল থেকে অনেক দূরে; মহৎ ঐতিহ্যের গরিমাই যেন প্রকাশ পেয়েছে।

বালির পরে বয়ে যেত স্বচ্ছ নদীর জল,
তেমনি বইত তীরে তীরে গাঁয়ের কোলাহল—
ঘাটের কাছে, মাঠের ধারে, আলো-ছায়ার স্রোতে;
অলস দিনের উড়নিখানার পরশ আকাশ হতে
বুলিয়ে যেত মায়ার মন্ত্র আমার দেহে মনে [...]।[১১]

পদ্মার মত কবির সৃষ্টিনিদর্শন সাধনাতে আছে একটি সুপ্রাচীন গোত্রগরিমা। পদ্মার আভিজাতিক ছন্দে যেমনি আছে রোমান্টিক সুদূরতার আভাস– 'একদিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর একদিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান'— তেমনি কবির সাধনাপন্থার সঙ্গে পদ্মার আভিজাতিক ছন্দের মিল আছে, যা হয়ে উঠেছে বৃহৎ ও মহৎ। কবি পদ্মার মতই রোমান্টিক, অতীতের স্বপ্নে আবিষ্ঠ, কল্পনায় বিভোর; তাই তাঁর সৃষ্টিনিদর্শন যা কিছু সুন্দর তাই ফুটে উঠেছে। কবির কাব্যের আঙিনায় যেমনি 'ছেঁড়া-কাঁথা' জড়ায় না, মেশায় না, তেমনি সুর-বেসুরের ঝঙ্কার তুলে না, গর্জনতর্জনে ও তাণ্ডবতরলে তাঁর হাতের বীণায় মহাদেশ গড়ে ওঠে না।

একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমায় সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ [...]।[১২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রান্তদেশে উপস্থিত হয়ে পদ্মাকে ছেড়ে 'কোপাই'-এর আকর্ষণ ও সাহচর্য কামনা করেছেন– উপরতলা থেকে নেমে এলেন নিচতলায়, মাটির কাছাকাছি। কোপাই নদীর সঙ্গে আছে পৃথিবীর দীনতম, তুচ্ছতম আর উপেক্ষিত অতিসাধারণ মানুষের সম্বন্ধ; যাদের যোগাযোগ 'কোপাই'-এর অনার্য নামের সঙ্গে খুবই নিবিড়। কোপাই নদীর সঙ্গে আর্যের কোনও গন্ধ নেই, আছে গোত্রগরিমাহীন অনার্যের গন্ধ, আছে অতিসাধারণ মানুষের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার বন্ধন।

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য তার নামখানি [...]।[১৩]

রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে সাধারণ মানুষের দুঃখেকষ্টে ভরা জীবনের সঙ্গে, যাদের সুগভীর সম্পর্ক কোপাই নদীর স্রোতে। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে প্রচানী-বাঙালি সাঁওতাল নারীর কলহাস্যে মুখরিত পরিবেশ ও সাধারণ মানুষের যত্নে পরিপুষ্ট সবুজ গাছের সমারোহের সঙ্গে। কোপাই বয়ে চলে গ্রামের খুব কাছ দিয়ে, এপারের সঙ্গে ওপারের মিতালি পেতে, শণের ফুলের সঙ্গে সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে।

গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।
তার এ পারের সঙ্গে ও পারের কথা চলে সহজে।
শণের খেতে ফুল ধরেছে একেবারে তার গায়ে গায়ে,
জেগে উঠেছে কচি কচি ধানের চারা।[১৪]

কোপাইর সান্নিধ্যে এসে কবির মনে সঞ্চারিত হয় কোপাই নদীর বিনম্র, সহজ, অনভিজাত্য ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ কোপাই নদীর সঙ্গে আত্মীয়তাবোধে ইচ্ছুক, অন্তর তাঁর ব্যাকুল; ফলে কবির সৃষ্টিনিদর্শন জগতে– বক্তব্য ও আঙ্গিকে, প্রকার ও

[১১] ছড়ার ছবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১২] চৈতালি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১৩] কোপাই, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১৪] কোপাই, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকৃতিতে– সবদিক থেকেই আধুনিক মেজাজের স্বাক্ষর বহন করে। তিনি উদ্ভাবন করেন 'ভাষার স্থলজল'– গদ্যছন্দ– গৃহস্থালি ভাষা; যে ভাষায় সত্য কথা প্রকাশ করতে অসুবিধে হয় না, বরং সহজে ব্যক্ত করা যায় বাস্তবতার চালচিত্রটি।

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।[১৫]

কোপাই সাধু ভাষায় কথা বলে না, বলে গৃহস্থ পাড়ার ভাষায়, সে ধরাবাঁধা ছন্দে চলে না, চলে মহুয়ামাতাল গাঁয়ের মেয়ের মত, যেন ঘুরে ঘুরে উড়িয়ে দেয় তার শাড়ির আঁচল, তাই রবীন্দ্রনাথের ছন্দ আবদ্ধ হয় জলেস্থলে গৃহস্থালি ভাষায়। কোপাই যেমনি গৃহস্থলকে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করে রাখে তেমনি কবি নূতন ছন্দে, নূতন উপলব্ধিতে সত্য সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট প্রকাশের নূতন ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। কবি তুলনা করেছেন পদ্মার সঙ্গে কোপাইকে। যে-পদ্মার সঙ্গে কবির ছিল সুনিবিড় সম্পর্ক, যে-পদ্মা ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস, কিন্তু কবি তাঁর জীবনের গোধূলিলগ্নে উপস্থিত হয়ে অন্যরকম বীণা বাজাতে শুরু করেন– বীণার তারে বেজে ওঠে 'কোপাই'-এর সুর, যে-সুর সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে।

একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মখে
নৌকার ছাদের উপর।
আমার একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখে পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে।
তার পরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে।[১৬]

বাস্তবতাকে অস্বীকার বা অতিক্রম না-করে কোপাইয়ের সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথ যে নবলোকের সন্ধান লাভ করেছেন তাকে আরও গভীরভাবে অনুভব করার উদ্দেশ্যে তিনি খোয়াইয়ের সংস্পর্শে আসেন। হবিগঞ্জের বুক ভেঙে বয়ে চলে খোয়াই, তেমনি তার সন্ধান মেলে শান্তিনিকেতনেও। খোয়াইয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে যখন একদিন তিনি শান্তিনিকেতনের পাশ দিয়ে, মাঠের মাঝ দিয়ে, 'লাল মাটির পথ' মাড়িয়ে এগিয়ে চলেন তখন। নদীর জল ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত– পলিপড়া চাষের জমি নদীকে চারদিক থেকে কোণঠেসা করেনি তখনও– আর পাড়ের উপর ছিল ঘন তালগাছ।[১৭] তিনি খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেন, তখনই দেখতে পান খোয়াইয়ের শাখা-প্রশাখার ক্ষীণস্বচ্ছ স্রোত, যে-স্রোতে ছিল উজানমুখো ছোট মাছের খেলা, আর স্থানে স্থানে জমে ওঠা মাটিতে বনোজাম, বনোখেজুর আর ঘন কাশবন। পদ্মা ও কোপাইয়ের চেয়ে আলাদা এই খোয়াই– এ-নদী নিঃসঙ্গ, আভিজাত্যের বাহারে আবদ্ধ নয়, বাস্ত বকে স্পর্শ করে বাস্তবতার মধ্যে বসবাস করে ধ্বংস ও সৃষ্টি সমান তালে চালিয়ে যায়। খোয়াইয়ের কালবৈশাখীর প্রলয়প্রবাহে সৃষ্টি হয় শাখানদী, উপনদী, দ্বীপ, বদ্বীপ। যারা খোয়াইয়ের সৃষ্টি দেখেছেন তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, তার সৃষ্টি একেবারেই নিখুঁত।

মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।[১৮]

সৃষ্টিতে যেন এতটুকু কমতি নেই, বেশতিও নেই, শুধু বাস্তবতায় বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিনিদর্শন সাধনাতে খোয়াইয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট। খোয়াইয়ের সংস্পর্শে এসে রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবে সাজিয়ে নিয়েছে তাঁর সৃষ্টিজগৎ– যতটুকু বর্ণনার প্রয়োজন

[১৫] কোপাই, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১৬] কোপাই, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১৭] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১৮] খোয়াই, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ততটুকুই স্থান দিয়েছেন, অতিরিক্ত বা অংশছেদের প্রয়োজন উপলব্ধি করেননি, অংলকার সৃষ্টি করেছেন ততটুকুই যা বাস্তবতাকে অতিক্রম করে না, সৃষ্টি করেছেন ঠিক ততটুকুই যা তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনকে অসুন্দর করে না, কবিতার ধর্ম সম্পূর্ণ বর্জন করে নয় অবশ্যই; এ যেন 'ঊর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়', যা খোয়াইয়ের মতই একেবারে নিখুঁত, অকৃত্রিম ও কল্পনাবাহুল্যবর্জিত। 'খোয়াই' কবিতায় পাওয়া যায় হবিগঞ্জের খোয়াইয়ের প্রকৃতরূপটিও।

পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।[১৯]

কবি চলেছেন রাঙামাটির রাস্তা বেয়ে অসম্পূর্ণতার বেদনাকে অতিক্রম করে নূতন জীবনানুভূতি অর্জনে, খোয়াই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছে জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি আপন গৌরবে যতই উন্নত হোক না কেন তার স্থায়িত্ব শূন্য, তাই রবীন্দ্রনাথের দেহ ও মনে একটি সতর্কতার বাঁশি বেজে ওঠে।

এই পথে ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে
ঘোড়সওয়ার বর্গি সৈন্যের মতো—
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল-সেগুনকে,
নূইয়ে দিয়েছে ঝাউয়ের মাথা,
'হায়-হায়' রব তুলেছে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্মা।[২০]

কবির সৃষ্টিনিদর্শনে বাংলার নদীগুলি সর্বাধিকভাবে বিকশিত, প্রশংসিত ও প্রকাশিত। তাঁর দান গ্রহনক্ষত্রভরা আকাশের মত অসীম। বাংলাদেশের নদীর বুকে ভ্রমণ করে রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রাণের লীলা অনুভব করেছেন, তাই তাঁর অন্তরাত্মা আপনা থেকে সৃষ্টির আনন্দে ভরে উঠেছে। বাংলার সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তরের মধ্যে সংগ্রহ করে বাংলার রূপ ও স্বরূপ প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।[২১]

[১৯] খোয়াই, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[২০] খোয়াই, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[২১] সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাটি

শিশু যেমনি বারবার মায়ের কাছে বায়না করে ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথও মাটির কাছে আবদার জানান, 'মাটি আমায় ডাক দিয়েছে/ আয় রে তোরা আয় আয় আয়।'[২২] মহৎ মানুষের মহত্ত্বই হচ্ছে মাটির সঙ্গে একটি বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপন করা, আত্মার মধ্যে মা ও মাটির গভীর সম্পর্কটি খুঁজে নেওয়া। যে-মাটিতে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে-মাটি তাঁর মা, তাঁর ধাত্রী; এই মাটির আশ্রয়েই 'প্রতিদিন [...] আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে'[২৩]। কবির কাছে বৈকুণ্ঠের চেয়েও কাম্য হয়ে উঠেছে মাটি– তার ঘাস, তার বাতাস।

আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা।

ওইখানে মোর বাসা
যে মাটিতে শিউরে ওঠে ঘাস,
যার 'পরে ওই মন্ত্র পড়ে দক্ষিণে বাতাস [...]।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিনিদর্শনে আছে মাটির গন্ধ, যাকে ঘিরে তাঁর সর্বপ্রেম, সর্বগুঞ্জন, সর্বমুখরতা প্রকাশ পেয়েছে, তাই ত তিনি তাঁর হৃদয়ের অর্ঘ্য বারবার মাটির উদ্দেশ্যে উপহৃত করেছেন। বাংলার মাটি কবিকে এক দুর্নিবার আকর্ষণে আকৃষ্ট করে ছিল বলেই তিনি তাঁর মৃন্ময়ি মায়ের 'মৃত্তিকার মাঝে ব্যাপ্ত' হয়ে থাকেন, যা ছিল তাঁর বহুকালের আকর্ষণ, তাই তিনি 'দিগ্বিদিকে আপনারে' দিয়েছেন 'বিস্তারিয়া/ বসন্তের আনন্দের মতো'[২৫]। কবি বাংলার মাটির বর্ণনায় আপ্লুত, মাটির কাছাকাছি আসতে পেরে তাঁর মন আনন্দে অধীর, আভিজাত্যের সীমানা অতিক্রম করে বাংলার বিচিত্র দৃশ্য অবলোচন করে তাঁর চিত্ত উল্লাসিত।

মাটিতে মিশিল মাটি,
যাহা চিরন্তন
রহিল প্রেমের স্বর্গে
অন্তরের ধন [...]।[২৬]

বিশ্বকবি পরমানুরাগে, অঙ্গুলির আন্দোলনে, স্পর্শ করে চলেছেন 'স্বর্ণশীর্ষ আনমিত শস্যক্ষেত্রতল'; কারণ তাঁর মন সর্বব্যাপী– 'জলে-স্থলে, অরণ্যেও পল্লবনিলয়ে,/ আকাশের নীলিমায়'[২৭]। কবি মাটির সঙ্গে অনন্ত-গগনে মিশে গিয়ে অশ্রান্ত চরণে সর্বমণ্ডল প্রদক্ষিণ করেছেন, যার কথা তিনি কোনও মতেই ভুলতে পারেন না। বাংলার মাটির আশ্রয়ে জন্ম নিয়ে, পুরোকাল কাটিয়েও তাঁর আত্মা তৃপ্তি পায়নি, বরং মৃত্তিকার স্তনব্য-রস-পিপাসা তাঁর মুখে লেগেই থাকে; মৃত্তিকাবক্ষের বিচিত্র ছবি কবির চোখে জাগিয়ে তুলে 'সুন্দর স্বপন'। যুগ যুগান্তরের মহামৃত্তিকার বন্ধন কবির পক্ষে কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়।

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে–
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া

[২২] চণ্ডালিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[২৩] পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীর উন্নতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[২৪] সেঁজুতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[২৫] বসুন্ধরা, সোনার তরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[২৬] স্ফুলিঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[২৭] শেষ সপ্তক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কেন যে, কব তা কেমনে [...] ।[২৮]

গীতাঞ্জলিতেও পাওয়া যায় মাটির গন্ধ, প্রকাশ পায় কবির আত্মার তৃষ্ণা, মাটির কোলে আশ্রয় পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা । কবির ইচ্ছা ছিল মাটি দিয়ে তাঁর সর্বসাধ মিটিয়ে নিতে ।[২৯]

এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা–
এইখানাতে আঁধার আলোয়
স্বপন-মাঝে চরা [...] ।[৩০]

পুরবীতে যখন বেজে ওঠে 'পুরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণা' তখন তিনি সন্ধান পেয়েছেন তাঁর মা হচ্ছে এই 'শ্যামল মাটি', যা তাঁকে চিরদিন ডাকছে ।[৩১] তিনি মাটির তিলকরেখাকে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তি বা পুরস্কার বলে গণ্য করেছেন, তাই ত তাঁর আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে মাটির একটি তিলকরেখা তাঁর কপালে এঁকে নিতে ।[৩২] কবির অন্তর মাটির বন্দনায় মুখরিত, তাই হয়ত তিনি মাটিকে খুব ভালো বেসেছেন; এমনকি তার শোভা, তার আলোও, ধূলি– সবই ।[৩৩] কবি ফিরে এলেন মাটির কাছে তাঁর অন্তরে জেগে থাকা মুক্তির জাগরণের বাণী শুনতে । মাটির সঙ্গে তাঁর আত্মা একাকার হয়ে যায় ।

যখন রব না আমি মর্তকায়ায়
তখন স্মরিতে হয় যদি মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন [...] ।[৩৪]

কবির কাছে সবচেয়ে সুপ্রিয়স্বর্গ হচ্ছে বাংলার মাটি, বাংলার পল্লীশ্রী । তিনি ধন্য বাংলা মায়ের কোলে জন্ম নিয়ে ।[৩৫] তিনি মাটির আশ্রয় লাভের আনন্দে আত্মহারা বলেই তাঁর বীণার সুর চলে যায় স্বর্গে– তাঁর সত্যলোকে ।[৩৬] মাটির কাছাকাছি থাকার বাসনায়, বাংলার মুখোমুখি বাসা বাঁধার আশায়, বাংলা মায়ের বুকের কাছে ক্ষমাস্নিগ্ধ আশ্রয় খুঁজে নিতে তিনি শান্তি নিকেতনে তৈরি করেন মাটির কুটির– 'শ্যামলী'[৩৭] ।

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী । [...]
সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিত
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জনা,
যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে [...] ।[৩৮]

কবি প্রথম দিকে ভারতবর্ষের স্বপ্নসৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেও জীবনের শেষ দিকে বাংলার মাটির আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, তাই ত বাংলাদেশের লোভনীয় ও সুন্দর মাটির বুকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন চোখজুড়ানো শ্যামলী মাকে ।

[২৮] উৎসর্গ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[২৯] গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৩০] গীতালি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৩১] শেষ সপ্তক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৩২] পত্রপুট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৩৩] চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৩৪] স্মরণ, সেঁজুতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৩৫] বলাকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৩৬] শেষ সপ্তক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৩৭] শ্যামলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৩৮] শেষ সপ্তক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

স্মিত হাসি কোমল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে
চৈত্ররাতের চাঁদের নিদ্রাহারা
মিতালিতে [...] ।[৩৯]

বাংলার মাটির মাধুর্য ও সৌন্দর্য লাভে প্রথম প্রকৃত বাঙালি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভালোবাসার গভীরতা প্রকাশ করেছেন তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে; ফলে তাঁর সৃষ্টিনিদর্শন হয়ে উঠেছে পদ্মা-কোপাই-খোয়াই, হয়ে উঠেছে রাঙা ক্ষেত, গ্রামের সরুবাঁকা পথ, শীতের ঘুঘুডাকা দুপুর; হয়ে উঠেছে যেখানে 'শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে' দুটি-চারটি গোরু চরে বেড়ায়, লেজ দিয়ে মাছি তাড়ায় নিরুৎসুক আলস্যভাবে সেখানে সঙ্গী ছাড়া একটি তালগাছের মাথায় 'সঙ্গ-উদাসীন নিভৃত' একটি চিলের বাসা ।[৪০]

তবু যদি চাও শেষ দান তার পেতে,
ওই দেখো ভরা খেতে
পাকা ফসলের দোদুল্য অঞ্চলে
নিঃশেষে তার সোনার অর্ঘ্য রেখে গেছে ধরাতলে [...] ।[৪১]

[৩৯] শেষ সপ্তক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৪০] শেষ সপ্তক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৪১] রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ৫৫ ।

কীট

রবীন্দ্রনাথ গোধূলিলগ্নে কোপাই-খোয়াই ও 'শ্যামলী'র সান্নিধ্যে এসে তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনের জগৎটিকে সাজিয়ে নিয়েছেন সাধারণ মানুষের উপযোগী করে, এমনকী নবালোকে তিনি দেখতে শুরু করেছেন ক্ষুদ্র তৃণলতাটি, ব্যাঙের খাঁটি কথাটি, নেড়ী কুকুরের ট্রাজেডিটি, পকেটে নেওয়া কাঠবিড়ালটি, ডেকে ডেকে সারা কোকিলটি, পথের ধারের মাকড়সার জালটি, পিঁপড়ের বাসাটি, কীটের সংসারটি। আপন সৃষ্টির অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিতেই হয়ত কবি ঠিক করেছেন তাঁর 'ভুল শোধরাতে হবে'[৪২]।

আমি মানুষ—
মনে জানি সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ,
গ্রহনক্ষত্র ধূমকেতুতে
আমার বাধা যায় খুলে খুলে।
কিন্তু ওই মাকড়সার জগৎ বদ্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে
ওই পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে
আমার সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ
সংসারের ধারেই।[৪৩]

যাওয়া-আসার পথের ধারে কীটের সংসার পাতা আছে, কখনও চোখে পড়ে, কখনও-বা পড়ে না, তবুও সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্র ওরা, 'কত যুগ থেকে অনেক ভাবনা ওদের', ওদের আছে 'অনেক সমস্যা, অনেক প্রয়োজন— অনেক দীর্ঘ ইতিহাস'।[৪৪] অচেনা, অজানা নীরব বিশ্বে ওদের সুর-ঘ্রাণ-সঙ্গীত— দুঃখ-বেদনার কথা— ব্যক্ত-অব্যক্ত হয়ে আছে। কবি ওদের নিয়েই রচনা করেছেন 'কীটের সংসার'। ওদের বাঁচার সম্বন্ধ, সন্তান-সন্ততিক্রমে জীবন থেকে জীবান্তরে বেঁচে থাকার সন্ধান, টিকে থাকার বিচিত্র প্রয়াস। কবি কীটকে দেখেছেন, এরসঙ্গে ওদের সংসারটিকেও। কীটজগতের মূল্য ও মর্যাদার পার্থক্য কবি আঁকেননি, যা তুচ্ছ তাই তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। কবি বলেছেন যে, বিশ্বজগৎ জুড়ে যে সুসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে পশুপক্ষী, গাছপালা সবই সুসঙ্গত।

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,
রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি,
কৃপণ হোয়ো না।[৪৫]

[৪২] ক্যামেলিয়া, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৪৩] কীটের সংসার, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৪৪] কীটের সংসার, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৪৫] বিশ্বশোক, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাই ত কবি পশুপক্ষী, গাছপালা সবার সন্ধান ও অনুভূতি খুঁজতে গিয়ে আরও গাঢ় ও বিচিত্র হয়ে উঠেছেন, আর বিশ্বসঙ্গতিতে কীটের সংসারও যে সংযুক্ত এর আভাস সুস্পষ্ট করে তুলেছেন সকলের সামনে।

আমি বললুম 'সে ত্রুটি আমারই,
থাকত ওর নিজের জগতের কবি
তা হলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,
আর সেই নেড়ী কুকুরের ট্র্যাজেডি।'[৪৬]

সৃষ্টির বৈচিত্র্যের অন্তরালে সুসঙ্গতভাবে যে-আছে জগৎব্যাপী তারই আবিষ্কার করেছেন কবি। তিনি অনন্ত বৈচিত্র্যকে জেনে নিয়েছেন। বৈচিত্র্যের অন্তর্গত বিশ্বসঙ্গতির স্পর্শলাভ করে জীবের জগৎ, কীটের সংসার তাঁর কাছে বিশ্ববৈচিত্র্যের অন্তর্গত একটি উপাদান হিশেবেই ধরা দেয়। কীটদের সংসার বিচিত্রসুন্দর, তবুও বিরাট বিশ্বে ওদের স্থান অসমান– এ কবির ভাবদর্শন। এমনি করে কবি অনুভব করেছেন যা অতিসাধারণ, যা অতিতুচ্ছ অথচ সত্য, যা এতকাল তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে ছিল উপেক্ষিত– এসবই তাঁর 'পুনশ্চ' কাব্যে অকথিত-বাণী হিশেবে প্রকাশ পেয়েছে। কবির মন এগিয়ে চলেছে নতুন দিগন্তের দিকে, তাই ত সামান্যতুচ্ছ ঘটনাগুলি কবির রঙেরসে পূর্ণ হয়ে এক অসামান্যভাবে, অপরূপ সৌন্দর্যে, ধরা দিয়েছে সকলের সামনে। অকৃত্রিম অনুভূতি দিয়ে সত্যকে পূর্ণসম্মানে গ্রহণ করার বাসনায় কবি তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে সঙ্গীহারা একটি শালিখের জন্য বীণার তারে সুর তুলেছেন, বেজে উঠেছে ভাষার সুনিপুণ আবরণ, কারণ তাঁর মন জীবনের শেষপ্রান্তরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝে নিতে চায় সত্যকে, তাই ভাষা হয়ে উঠেছে নিবারণ– নির্মম-কদর্য বাস্তবতায় সমাদৃত।

শালিখটার কী হল তাই ভাবি।
একলা কেন থাকে দলছাড়া।
প্রথম দিন দেখেছিলেম শিমুল গাছের তলায়,
আমার বাগানে,
মনে হল একটু যেন খুঁড়িয়ে চলে।
তার পরে ওই রোজ সকালে দেখি–
সঙ্গীহারা, বেড়ায় পোকা শিকার ক'রে।[৪৭]

[৪৬] ছেলেটা, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৪৭] শালিখ, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মানুষ

আমরা মানুষ, ভালোবাসার জন্যে বাসা বাঁধি,
চিরকালের ভিত গড়ি তার গানের সুরে;
খুঁজে আনি জরাবিহীন বাণী
সে মন্দিরের গাঁথন দিতে [...]।[৪৮]

রবীন্দ্রনাথের অন্তর সাধারণ মানুষের জন্য আত্মহারা, কবি তাঁর বিশাল জীবনপথে মানুষের সন্ধান ও আত্মার বন্ধন খোঁজতে আগ্রহী ছিলেন, তাই ত তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসে মানুষদেবতার অন্বেষণ করেছেন, বন্দনা করেছেন ব্রাত্যের। 'আমি কবি ওদের দলে/ আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন [...]।[৪৯] কবি নিজেকে এ-ব্রাত্যের দলভুক্ত করে, গোধূলিলগ্নে বসে, দেখে নিয়েছেন সাধারণ মানুষের মাঝে তাঁর আসন আসলেই পাতা হয়নি, এক্ষোভ প্রকাশ করতেই বোধ হয় কবি বলেছেন, 'কোনখানেই নেই আমি।'

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের পশ্চাৎপদ রাশিয়ায় মহান নভেম্বর বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পরবর্তী সময়কালে বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রামকে নতুন মাত্রা দিয়েছিল। বিশ্বে সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেভিয়েত ইউনিয়নকে আঁতুরঘরে হত্যা করার জন্য চোদ্দটি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী-সামন্তবাদী রাষ্ট্রের আক্রমণের মোকাবিলায় সদ্যোজাত সমাজতান্ত্রিক সরকার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাধারণ মানুষের দ্বারা গড়ে ওঠা দৃঢ় সংগ্রাম এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। একদিকে ঘরে-বাইরের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী-সামন্তবাদী ও কুলাকসহ তামাম প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে-দিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র সুদৃঢ় করেছিল; অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-সামন্তবাদবিরোধী সংগ্রামের পীঠস্থানে পরিণত হয়ে উঠেছিল। কমরেড ভি আই লেনিনের পরিচালনায় রুশ বলশেভিক পার্টির দ্বারা সংগঠিত এই মহান বিপ্লব বিশ্বের মুক্তিকামী, শ্রমজীবীসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের শোষণ-বঞ্চনার অবসানকল্পে সঠিক পথ দেখিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবেই তা দেখেছেন, তাই ত তিনি সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা নিবেদন করে বলেছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'[৫০]

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণের কারণে রবীন্দ্রনাথের জীবন-বাতায়নে একটি নূতন দরজা খুলে যায়, তিনি সেখানে দেখতে পান একদিকে যেমন মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নূতন জীবনযাত্রার উদযোগ চলছে তেমনি অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী-সামন্তবাদী সভ্যতার নগ্নরূপটিও প্রকাশ পাচ্ছে, যা মানুষের অপমর্যাদা সমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে; এই দুটি ছবিই কবির দৃষ্টিকে প্রসারিত করে সাধারণ মানুষের দিকে। তখন থেকেই তাঁর চেতনায় বৈপ্লবিক চিন্তাপ্রবাহ সূচিত হয়। পুরাতন উপলব্ধিকে নতুন জ্ঞানের আলোয় বাঁধতে এবং সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে নতুন জিজ্ঞাসা, আকর্ষণ ও উপলব্ধি প্রকাশ করতে তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে নূতন মাত্রা যোগ করতে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আভিজাত্যের বেড়া ডিঙিয়ে কবি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার বাসনায় ও তাদের নানা কর্ম-সাধনা, আনন্দ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সফলতা-ব্যর্থতায় প্রভাবিত হয়ে সাধারণ মানুষের নানা বিষয় তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনের উপাদান হিশেবে ব্যবহার করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। একইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল– শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর, কালিগ্রাম, নাটোর, রামপুর, সিলেট– ভ্রমণ করেছেন; এছাড়া তিনি ঠাকুর পরিবারের জমিদারী পরিদর্শন ও পরিচালনার কাজে নিজেকে নিযুক্ত

[৪৮] গানের বাসা, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৪৯] পত্রপুট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৫০] কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

করায় বাংলার মানুষকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন; ফলে দেখে নিয়েছেন বাঙালির হাসিকান্না, আনন্দবেদনা, সমস্যাসংকট, প্রেমভালোবাসা; তাই ত তিনি মানুষের মাঝে ছাড়া পেতে চেয়েছেন ।

তাই ফিরে আসতে হোল
আর একবার
দিনের শেষে নতুন পালা আবার
করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে
ভালবাসার দোহাই মেনে ।[৫১]

সাধারণ মানুষ নিয়েই বাংলা-সমাজের চৌদ্দ-আনা অংশ; তাই তাদের অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, কুসংস্কার-অনাচার, অশিক্ষা-কুশিক্ষার অনড়-অন্ধকার রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ান্তরকে ভাবান্বিত করে তুলেছে । কবি এজন্যই তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে তুলে এনেছেন অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত মানুষের কথা । তিনি চেয়েছেন 'স্বর্গের উপর আড়ি' ধরে তাঁর 'দরিদ্র মায়ের ঘর' আলোকিত করতে ।[৫২] কবির বৈকুণ্ঠের প্রত্যক্ষ জীবনে সান্ত্বনা নেই; তাঁর জীবনের স্তরের পর স্তর পেরিয়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট সত্যে পৌঁছোনোর আগেই তিনি যেন ধরাছোঁয়ার প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনটিকে উপেক্ষা করেছেন বলে তাঁর মনে হয়েছে– যা অসম্পূর্ণতাই; ফলে তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে ভীড় করেছে মোহনলাল– 'রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চশমা,/ দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিঙের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায়'; রেশমি জামা পরা যুবকটি– যে 'কমলার পাশে পা ছড়িয়ে/ হাভানা চুরোট খাচ্ছে'; সাঁওতাল মেয়েটি– যার 'কানে, কালো গালের উপর আলো করেছে' ক্যামেলিয়া; আধবুড়ো হিন্দস্থানী রোগা-লম্বা মানুষটি– যার 'পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ/ শুকিয়ে-আসা ফলের মতো'; হিরণমাসির বোনপোটি– যে 'যখন খুশি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে'; অপরাধী তিনু– সে 'অপকার করে কিছু না ভেবে,/ উপকার করে অনায়াসে'; আর সেই 'ছেলেটা'– যার বয়স 'বছর দশেক' । আগাছা যেমনি ভাঙা বেড়ার ধারে মালীর অযত্নে বেড়ে ওঠে তেমনি মা-মরা অনাদরে পরের ঘরে মানুষ হওয়া 'ছেলেটা' । 'ছেলেটা' গাছ থেকে পড়ে, হাড়ভাঙে, বিষফল খায়, কাদা মেখে কাপড় ছিঁড়ে, মার খায়, গালি খায়– তবুও বাঁচার শক্তি তার যেন অদম্য । শত অবহেলাতেও সে মরে না, বরং বাঁচার ক্ষমতা তার আরও দুর্বার হয়ে ওঠে । এতে এঁকেছেন একটি মা-মরা উপেক্ষিত ছেলের ছবি; যেকোনও ছেলের ছবি নয়, বিশেষ প্রাণীর চিত্রও নয়, অথচ বালকস্বভাবের কয়েকটি সত্যতথ্য যেন আপনা থেকে বেরিয়ে এসেছে তাঁর কালি ও কলম দিয়ে । অল্পবয়সে মাকে হারিয়ে পরের উদাসীন আবহাওয়ায় মানুষ হয় যে ছেলেটি তাকে বাঁচতে হলে যে-কয়েকটি পন্থা তার সামনে খোলা থাকে তার মধ্য-থেকে যে-পথটি বেছে নিতে হয় সেটি হচ্ছে বেপরোয়াভাবে বেড়ে ওঠা । স্নেহের বাঁধন যেখানে নেই সেখানে বেপরোয়াভাবে বেড়ে ওঠার পথটিই যেন তার কাছে খুলে যায়– এসত্য কথাটি কবি এঁকেছেন তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে । মায়ের স্নেহযত্ন থেকে বঞ্চিত হলেও প্রকৃতি যেন তার সহায় হয় ।

আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধুলোবালি—
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে,
কখনো মাড়িয়ে দেয় গরুতে— [...] ।[৫৩]

অনন্ত আকাশ, দূরান্তে বিস্তীর্ণ শুষ্কসরস বিচিত্র বর্ণের মাটি, আর তার বুকে অমৃত আশ্রয়ে জাত ও পরিপুষ্ট গাছপালা, পশুপাখি– এসবই তার অন্তর্লোকে প্রবেশ করে । এরইমাঝে অল্পবয়সে মা-মরা সন্তান ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বপ্রকৃতিতে ।

ছেলেটা স্কুল পালিয়ে খেলা করছে
হাঁসের বাচ্চা বুকে চেপে ধ'রে
খাটের উপর একলা ব'সে
সমস্ত বিকেল বেলাটা [...] ।[৫৪]

[৫১] পত্রপুট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৫২] ছিন্নপত্রাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী ।
[৫৩] ছেলেটা, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৫৪] ফাঁক, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বিচিত্র হলেও কাব্য সর্বত্রগামী নয়, তাই ত কবির 'শেষ বেলাতে' যে পথিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়ে ওঠে বন্ধনছিন্ন। কবির বেদনা সাধারণ মানুষের জন্যে। কবি মাপা ভাষায় প্রকাশ করেছেন দুঃখের তীব্রতা, যা প্রকাশ করার জন্যে তিনি তীব্র ভাষা বা মর্মান্তিক আক্ষেপের আশ্রয় নেন না। কথার ছলে জীবনের অবলম্বন করে দু'চারটি উক্তির মাধ্যমে জীবনের বিড়ম্বনাকে সুতীব্র করে তুলেছেন মাত্র। এ-পীড়াটুকু শোনা যায় তাঁর 'বাঁশি' কবিতায়ও। কিনু গোয়ালার গলিটি যেন সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে কবির সামনে ধরা দেয়, ধরা দেয় এ-গলির বাসিন্দা পঁচিশ টাকা বেতনের 'সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি'[৫৫]। ভিতরে সৃষ্ট বিড়ম্বনা খুবই স্পষ্ট, কিন্তু বর্ণনা অতি সামান্য। লোনা ধরা মাঝে মাঝে ধসে পড়া দেয়াল, মেঝেতে স্যাঁৎসেঁতে দাগ, গণেশের ছবি– এসব বর্ণনার মাঝে দারিদ্র্যের অসহায় রূপটি যেন ভাষাহীনভাবে মনে পীড়ার সৃষ্টি করে। পচা খোসা আর কাঁঠালের ভূতির স্তূপ, পচা মাছের কানকো, মরা বেড়ালের দুর্গন্ধ– সবমিলে নিদারুণ করে তুলে হরিপদদের জীবন, সঙ্গে সবারই। কবির সৃষ্টিনিদর্শনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যায় জগতের আধমরা মানুষগুলি। হরিপদ কেরানির জীবনও আধমরা জগতের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ভালোভাবে বাঁচার আশা বা চেষ্টা নেই তার, নিরাশ হয়ে অধঃপাতে যাওয়ারও কোনও চাঞ্চল্য দেখা যায় না, ঈর্ষা-ক্ষোভ-ক্রোধ-হিংসার কোনও দুর্লক্ষণও নেই তার মাঝে; একরকম করে বেঁচে থাকা যেন। এমনকী অভাগা হরিপদ কেরানি তার অভাবের জন্য, অন্নের অভাবেই, প্রেমের আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও, তার জীবন থেকে প্রেমের মধুর স্বপ্নকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়; বড় করুণ তার জীবন, ব্যর্থ তার প্রেম।

ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল–
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে [...]।[৫৬]

হরিপদ একা একা জীবন কাটায়; বাসায় একা, আপিসেও একা, যদিও চতুর্দিকে লোকজন ঘুরে ফিরে, কথা বলে, কারও কারও সঙ্গে তার কর্মসূত্রে কথাবার্তাও হয়, তবুও সে একা– নিঃসঙ্গ, ট্রামে-বাসে সর্বত্র সে যেন বিযুক্ত। শেয়ালদা স্টেশনে অসংখ্য লোকের কর্মব্যস্ততা তাই সে উদাসীন চোখে দেখে, তার দেখতে ভাল লাগে না, মন্দও লাগে না, শুধু দেখে সেটুকুই যেটুকু দর্শকের মন-মগজে দাগ কাটে, তবুও শেয়ালদা স্টেশনের অসংখ্য লোকজন ও কর্মতাড়না হরিপদ কেরানির জীবনকে নিঃসঙ্গ করে তুলে, এ নিঃসঙ্গতা অবশ্য দুঃসহ নয়, কারণ অসাড় মনে সুসহ-দুঃসহ কিছুই থাকে না, অথচ তার মন জানে সে নিঃসঙ্গ, কারণ তার কেউ নেই, সেও কারও নয়; তবুও 'সমস্ত আকাশে বাজে/ অনাদি কালের বিরহবেদনা'[৫৭]। হরিপদ কেরানি নিঃসহায়, তার জীবনে কোনও কল্পনা জেগে ওঠে না, আর যদি জেগেও ওঠে তখন তার অন্তরের অন্তস্তলে বিষাদের সুর বাজতে থাকে; আর এই অন্তরের বিষাদের সুরটি বাইরেও একটি আমেজ সৃষ্টি করে, যা ভীরুকম্পন থেকে ক্রমশ ঝঙ্কার তুলতে থাকে, অবসাদের শাসন শিথিল হয়, কল্পনা মুক্তি পায়, কিন্তু বিষাদের অনুভূতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবেশ করে, ফলে দৃষ্টি খুলে যায়, এ দৃষ্টি বিষাদের, আশার জগতের নয়; তাই হয়ত হরিপদ কেরানির কানে বাঁশি বাজতে থাকে, প্রাণেও। ভীরু মনে বিষাদের সুর জাগতেই বাঁশির আহ্বান। কল্পনায় সত্য সৃষ্টি হয়; দর্শন ঘটে আকবর বাদশাহের সঙ্গে। সত্য প্রকাশিত হয়, হরিপদ কেরানি যা আকবর বাদশাহও তা, যদিও তার দুঃখের সঙ্গে আকবর বাদশাহর কোনও যোগাযোগ নেই, তাই তার দুঃখে কোনও পৌরুষত্ব নেই, তবুও এক মহৎ সান্ত্বনার সৃষ্টি হয়, হয়ত সত্যে পৌঁছে যায় বলে, তবে এ সান্ত্বনার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার নয়, খানিক অসংলগ্ন অনুভূতি, খানিক কল্পনা, খানিক পুরনো বিশ্বাসের টান– এসব মিশ্রিত ভাবানুভূতিই সান্ত্বনার সৃষ্টি করে— অন্তত বাস্তব দৃষ্টি এর চেয়ে বেশি কিছু দেখায় না। বৈকুণ্ঠের দিকে চলেছে সবাই, গোধূলিলগ্নে সত্য হয়ে ওঠে অনন্ত বিরহের সুর, যে-সুরের মাঝে তমালের ঘন ছায়ায় ঘেরা ধলেশ্বরীর তীরে যার সন্ধান মিলে তার পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর [...]।[৫৮]

[৫৫] বাঁশি, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৫৬] বাঁশি, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৫৭] বাঁশি, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৫৮] বাঁশি, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিরহের সুর বাজতে থাকে। এ সুরের মধ্যে, এসব শব্দের সমবায়ে ভাবের যে অনুষঙ্গ এতদিন ধরে গড়ে উঠেছিল তা গোধূলিলগ্নে রবীন্দ্রসৃষ্টিনিদর্শনে স্নিগ্ধভরা রসে ভরে ওঠে। স্নিগ্ধভরা রসে কবি লিখেছেন সাধারণ একটি মেয়ের কথা, মেয়েটি বলে, 'আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,/ চিনবে না আমাকে'[৫৯]। অত্যন্ত সাধারণ একটি মেয়ের গল্প– তার না আছে বিদ্যার ছটা, না আছে বাকনৈপুন্য, না আছে পুরুষের মন ভোলানোর জন্য দেহসৌষ্ঠব; তবে তার ঈর্ষা নেই, অভিযোগও না, সে খুবই সাধারণ। তার অন্তরে আছে নারীত্ববোধ, ধ্যান ও প্রেমের অভিমান, আত্মধিক্কার আর মর্মান্তিক বেদনা। তার জীবনে কোনও স্বপ্ন নেই, আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনও মূল্য নেই; এ-জীবন যে তাদের কাছে এক দুঃসহ বোঝা– রবীন্দ্রনাথ তা বুঝেছেন।

তোমার নাহি শীত বসন্ত
জরা কি যৌবন–
সর্ব ঋতু সর্ব কালে
তোমার সিংহাসন।[৬০]

কবি জেনে নিয়েছেন পুরুষ যুগযুগ ধরে নারীর জেলখানার দারোগাগিরী করে আসছে, এর নিষ্ঠুরতা কল্পনাতীত, যার কল্পনা করার শক্তি পুরুষেরও নেই।[৬১] রবীন্দ্রনাথ এও জেনে নিয়েছেন পুরুষের তৈরি সামাজিক কুসংস্কার, অত্যাচার, অনাচার, অজ্ঞতা নারীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, কিন্তু নারীকে এভাবে পিছনে ফেলে রাখা সমাজের উন্নতির পথটিই কঠিন করে; এ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অন্যায়-অবিচার, বঞ্চনা-বেদনা ও পুরুষের হৃদয়হীনতা থেকে নারীসমাজকে মুক্ত করার জন্য এবং নারীর মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাধিকারবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক নারীর উক্তিতে কবি বলেছেন, 'হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাকহীনা,/ রক্তে মোর জাগে রুদ্র বাণী।/ উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে/ জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে/ কণ্ঠ হতে/ নির্বারি স্রোতে।'[৬২] কবির মনে দীর্ঘপোষিত আশা– নারীর অধিকার ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি চেয়েছেন নারী যেন নিজের হৃদয়কে মুক্ত করে, বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করে, জ্ঞানের তপস্যায় নিষ্ঠা প্রয়োগ করে।[৬৩] তাছাড়াও নারীমনের প্রতিবাদ ও তার মুক্তির প্রয়াস তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ পেয়েছে; যেমন, কবিতায়– 'মুক্তি', 'ফাঁকি', 'মায়ের সম্মান', 'নিষ্কৃতি', 'কালো মেয়ে'; গল্পে– 'দেনাপাওনা', 'কঙ্কাল', 'জীবিত ও মৃত', 'শাস্তি', 'খাতা', 'স্ত্রীর পত্র', 'মুসলমানীর গল্প', 'বদনাম'; উপন্যাসে– 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'চার অধ্যায়'; নাটকে– 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'চিত্রাঙ্গদা', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'নটীর পূজা' প্রভৃতি; কিন্তু আদর্শবাদী একজন সাহিত্যিক তার সাহিত্যে সাধারণ এক মেয়ের দুঃখ ও ত্যাগের পথ নির্ধারণ করতে অসামান্যতা প্রকাশ করেন, কিন্তু বিশ্বকবি তা করেননি।

তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে [...]।[৬৪]

সাধারণ নারীর মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা অব্যক্ত কথাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিনিদর্শনে। কবির একান্ত প্রত্যাশা সাধারণ নারীর মধ্যে যে রহস্যটুকু লুকিয়ে আছে তা যেন রসজ্ঞ সাহিত্য সম্রাটরা ফুটিয়ে তুলেছেন।

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্তই সাধারণ মেয়ে গল্প–
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে–
অর্থাৎ, সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,

[৫৯] সাধারণ মেয়ে, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৬০] ক্ষণিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৬১] নারী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩।
[৬২] সবলা, মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৬৩] কালান্তর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৬৪] সাধারণ মেয়ে, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হার হয়েছে আমার ।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে ।[৬৫]

বিধাতা যে-স্থলে নারীকে দিয়েছেন মান ও স্থান, তাঁর সহকারী রূপে সে-স্থলে বাংলাদেশের নারীর এ অধঃপতন সত্যিই বেদনাদায়ক ।

সৃষ্টি বিধাতার
নিয়েছ কর্মের ভার
তুমি নারী
তাহারি আপন সহকারী ।
বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্যে
বহ চুপি চুপি
মাধুরীর রূপে ।[৬৬]

রবীন্দ্রনাথের এ-শ্রেণীভুক্ত তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে আধুনিক সুরই সুস্পষ্ট । কবিমানসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়, বস্তু, ভাষা, ছন্দ, চিত্রকল্প সবই বদলে গেছে । পদ্যছন্দের পরিবর্তে এসেছে গদ্যছন্দ । কবির কাব্য হয়ে উঠেছে বাস্তববাদী ও জীবনধর্মী, কারণ রবীন্দ্রনাথ জেনে নিয়েছেন সভ্যতার 'উল্টপাল্টের' মধ্য দিয়ে 'এক প্রশস্ত পথে' এগিয়ে চলেছে নারীর জীবনের মূলধারা ।[৬৭] প্রকৃতির কারণেই 'নারী পুরাতনী'[৬৮] । তাই ত বাংলার নারী অবরোধ প্রথার শিকার হয়েও পশ্চাৎপদতা মেনে নিতে রাজি নয় ।

আমি বাংলাদেশের মেয়ে ।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেননি
আমাকে মানুষ করে গড়তে
রেখেছেন আধাআধি করে ।
অন্তরে বাইরে মিল হয়নি
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয়নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয়নি শক্তিতে আর ইচ্ছায় ।
আমাকে তুলে দেননি এ যুগের পালের নৌকায়,
চলা আটক করে ফেলে রেখেছেন
কালো স্রোতের ওপারে বালু-ডাঙ্গায় [...] ।[৬৯]

রবীন্দ্রনাথের এ-শ্রেণীভুক্ত তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে বাংলার নারীর রূপ বাস্তব, অনেক বেশি মাটিঘেষাঁ । শুধু কী তাই! এরসঙ্গে আছে একটি সফল আঙ্গিক নিরীক্ষাও । শব্দ ব্যবহারে কবি মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত— বিশেষত পোড়া খাওয়া, মরা খাওয়া, আটপৌড়ে বাঙালির মত অলঙ্কারমুক্ত; নিবাভরণ হতে সচেষ্ট, যে অলঙ্কার বোঝা হয়ে দাঁড়ায় তার সন্ধান এতে নেই; তিনি সম্পূর্ণ সফল, তবে কবির আদর্শ– প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা । কবির এসব সৃষ্টিকর্মে পরিপূরক গদ্যচ্ছন্দে নতুন কাব্যদর্শন উপজীব্য হয়ে উঠেছে– সাধারণ মানুষের নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন, যুগযন্ত্রণা, সংসারের তুচ্ছ অতি-তুচ্ছ বিষয়, পারিপার্শ্বিকতা; ফলে স্থান করে নিয়েছে চিত্রধর্মী উপমা ও যথাসম্ভব অনার্য ভাষা । 'পুনশ্চ' সমগ্র রবীন্দ্রসৃষ্টিনিদর্শনপ্রবাহে অভিনব ও নব সৃষ্টি । বাঁশি, ছেলেটা, সাধারণ মেয়ে প্রভৃতি কবিতায় প্রাত্যহিক জীবনের দীনতার মধ্যে, ধূলিমলিনতার মধ্যে কবি জীবনসত্যকে খুঁজে পেয়েছেন ।

[৬৫] সাধারণ মেয়ে, পুনশ্চ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৬৬] আরোগ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৬৭] নারী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ ।
[৬৮] নারী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩ ।
[৬৯] রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ৯৫ ।

আমি যে দেখেছি— প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে ।[৭০]

রবীন্দ্রনাথ বাংলার মানুষের করুণ, কষ্ট ও যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন তাঁর 'দুই বিঘা জমি', 'এবার ফিরাও মোরে', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ', 'অপমান', 'ধুলামন্দির', 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি কবিতায় । 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবিকে সামাজিক দায়িত্বের প্রতি আগ্রহী মনে হয় । সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ-সামন্তবাদের উলঙ্গ আত্মপ্রকাশে আর্তনিপীড়িত মানুষের ক্রন্দনের মাঝে বসে কবি আর 'মানসী' কিংবা 'সোনার তরী'র সুরে বীণার তার বাঁধতে পারেননি । নিজের মনোযোগ এতদিন অন্যদিকে ছিল বলে কবি যেন নিজেই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ।

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি । ওরে তুই ওঠ আজি; [...] ।[৭১]

কবি দেশব্রতীর মত বাংলাকাব্য জগতে একটি ঐতিহাসিকপর্ব সৃষ্টি করতে কোনও কোনও কবিতায় বাংলাদেশের দরিদ্র-ক্লিষ্ট-নিগৃগীত-নিষ্পেশিত মানুষের দুর্দশার ছবি তুলে ধরেছেন ।

[...] ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে– ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্দে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দু'টি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া । সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে [...] ।[৭২]

অন্যত্র

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা– সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার ।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্যে, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট ।[৭৩]

অসহায় ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি এরকম মমত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় । এসব রচনা থেকে সহজেই প্রকাশ পেয়েছে যে, অসহায় দুঃস্থ মানুষের কথাচিন্তা রবীন্দ্রনাথ গভীর মর্মবেদনায় অনুভব করেছেন; সাধারণ মানুষের করুণ ও বাস্তবচিত্রটি কবিকে আহত করেছে; তাই হয়ত এসব মানুষ সম্বন্ধে তাঁর মনে জাগ্রত হয়েছে সম্ভ্রমবোধ ।

[৭০] প্রশ্ন, পরিশেষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৭১] এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৭২] এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৭৩] এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

তিনি জেনেছেন এসব অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষই হচ্ছে বাংলাদেশের মূলশক্তি। তাদের জীবনে উন্নয়ন না ঘটলে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটতে পারে না, তাই মানুষের কবি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য দাবী জানিয়েছে তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে।

[...] এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা– এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা– ডাকিয়া বলিতে হবে—
'মুহূর্ত তুলিয়া শির' একত্র দাঁড়াও দেখি সবে [...]।[৭৪]

নিজের দেশকে ধন-মন-প্রাণ দিয়ে জানার জন্য, দেশের বিরাট জনসাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পল্লীবাংলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নিয়েছেন; কারণ তিনি জেনেছেন যে, গ্রামের কোনও বাঁশবনে দাঁড়িয়ে কারওকে চাচা বা ভাই বলে সম্বোধন করাই নয় যে, পল্লীবাংলাকে সম্পূর্ণভাবে জেনে নেওয়া।[৭৫] তাই ত রবীন্দ্রনাথ শিলাইদা, পতিসর– এরকম নানা পল্লীতে বসবাস শুরু করে প্রত্যক্ষ করেছেন পল্লীবাংলার জীবন, পল্লীজীবন। তাঁর চোখে ধরা দিয়েছে পল্লীজীবনের একদিকে যেমন আছে বাইরের ছবি– নদী, প্রান্তর, ধানক্ষেত, ছায়াতরুতল, পল্লীকুটির; ঠিক তেমনি অন্যদিকে আছে পল্লীজীবনের অন্তরের ছবিটিও– দরিদ্রতার অভিশাপ, অত্যাচারে জর্জরিত মানুষে অসহায় অবস্থা, প্রবঞ্চিত ও পীড়িত দৈন্যজীর্ণ দেহ। এতদিন যাকে জানতে পারেননি তাকে জেনেই তিনি তাঁর পূর্বেকার না-জানার বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিনিদর্শনে। ছেলেবেলা তাঁর সময় কেটেছে শহরে, একটি বাড়ির মধ্যে, এ যেন একটি 'খাঁচা'। শহরবাসীর মত ঘুরেফিরে বেড়ানোর স্বাধীনতাও ছিল না তাঁর, একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার এককোণে বন্দী ছিলেন তিনি– যেখান থেকে শুধু, খোলা জানালা দিয়ে, দেখতে পেতেন সামনের বাগানটি, পুকুরটি, লোকজনের স্নান সেরে ঘরে ফেরার দৃশ্যগুলি, অদূরের অবস্থিত বটগাছটি– যার ছায়া শুধু চোখে পড়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়। বহির্জগতের সঙ্গে এই ছিল কবির পরিচয়, স্বপ্নে পরিচয়, একটি সৌন্দর্যের আবেশ সৃষ্টি করার পরিচয়। যেসব দৃশ্য জানলার ফাঁক দিয়ে কবির দৃষ্টিগোচর হয়, তার থেকে বেশি ছিল পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না-ঘটার বেদনাই, যা তাঁকে সবসময় কাঙাল করে রেখেছে।[৭৬]

পল্লীজীবনের সঙ্গে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক গড়ে ওঠে নদীপথে পূর্ব-বাংলার নানাস্থান ভ্রমণের সময়, তখনই তাঁর হৃদয়দ্বার খুলে যায়, তখনই তিনি অন্তরঙ্গভাবে, ভালোবাসার দৃষ্টিতে অনুভব করেছেন পল্লীজীবনের আনন্দ ও দুঃখগুলি, যা বাংলাদেশের খুব অল্প লেখকই রসবোধের চোখে দেখেছেন।[৭৭] রবীন্দ্রনাথ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করেছেন বাঙালির প্রাণ পল্লীজীবনকে, যদিও তিনি মদিরাসক্তের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আকণ্ঠ পান করেছেন তবুও।

ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে দ্বানের ঘাটে,
সর্ষে তিসির খেতে
দুই বড়ো সুর মিলেছিল অবাক আকাশেতে;
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অন্তরবির রাগে-
বলেছিল, এই তো ভালো লাগে।
সেই-যে ভালো-লাগাটি তার যাক সে রেখে পিছে,
কীর্তি যা সে গেঁথেছিল হয় যদি হোক মিছে,
না যদি রয় নাই রহিল নাম
এই মাটিতে রইল তার বিস্মিত প্রণাম [...]।[৭৮]

রবীন্দ্রনাথ পল্লীজীবনকে দেখতে পেয়েছেন মাটির কাছাকাছি এসে, নদীর তীরে এসে, বাস বেঁধে; তখনই তাঁর সামনে ধরা দিয়েছে পল্লীবাংলার অভাগা মানুষগুলি, তাদের অভাব, তাদের অভিযোগ; সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে তাদের জন্য একরকম বেদনা জেগে উঠেছে। পল্লীবাসীরা যে কত অসহায় তা তিনি 'বিশেষভাবে উপলব্ধি' করেছেন এবং অনুভব

[৭৪] এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৭৫] পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীর উন্নতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৭৬] পল্লীপ্রকৃতি, অভিভাষণ, বাঁকুড়ার জনসভায় কথিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৭৭] পল্লীপ্রকৃতি, অভিভাষণ, বাঁকুড়ার জনসভায় কথিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৭৮] রবীন্দ্র রচনাবলী, ২২ খণ্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা।

করেছেন যে, বাঙালি জীবনের ভিত্তিই হচ্ছে পল্লীবাংলা।[৭৯] পল্লীজীবনকে নিয়ে আধুনিকরা যতটুকু ভেবেছেন ততটুকু রবীন্দ্রনাথও ভেবেছেন, বরং একটু বেশিই, তিনি ভেবেছেন পল্লীজীবনের অধিকার-সাম্য-সুবিচার-শ্রম-সাধনা-চেষ্টা-পরিশ্রম নিয়েও; এজন্যই তিনি ব্যথিত চিত্তে সকল শ্রেণীর বাঙালিকে আহ্বান করেছেন বাঙালির সামনে যে অভাব-অভিযোগের 'উত্তুঙ্গ শিখর দাঁড়িয়ে' আছে তাকে ভয়ের চোখে না-দেখে উত্তীর্ণ করা প্রয়োজন।[৮০]

মাকে বাদ দিয়ে যেমন সন্তানের পরিচয় হয় না তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাছে পল্লীজীবনকে বাদ দিয়ে তাঁর সৃষ্টিনিদর্শন সৃজন করা সম্ভব নয়। পল্লীজীবনের দুঃখ-দুর্দশার চিত্রগুলি তাঁর জীবনের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করে, তাঁর অন্তরকে স্পর্শ ও বিচলিত করে; তাই ত তিনি তাঁর 'হৃদয়ের কাজ' পল্লীজীবন থেকেই শুরু করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।[৮১] রবীন্দ্রনাথের মত কেউ বাংলা-সাহিত্যে গভীরভাবে পল্লীর নিঃসহায় অধিবাসীদের বেদনার কথা, পল্লীজীবনের কথা প্রকাশ করেননি, যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে।[৮২]

রবীন্দ্রনাথ জেনে নিয়েছেন পল্লীজীবন কীরকম অভাব-দুঃখ-অন্ধতা-নিঃসহায়তা নিয়ে আচ্ছন্ন।[৮৩] একইসঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, অধিকার-বণ্টনের সমস্যা তিনি উপলব্ধি করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, স্বার্থ যেখানে প্রবল সেখানে মিলন অসম্ভব, আর অর্থনৈতিক সমস্যা কম হোক বেশি হোক তা আধুনিক সমস্যা, যা শহরের সঙ্গে সংযুক্ত। শহরের মানুষগুলিই একে জিইয়ে রেখেছে এবং এই বিভেদরেখা নিজেদের স্বার্থে দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে, ফলে দরিদ্র, অশিক্ষিত পল্লীবাসী হচ্ছে এ মারাত্মক স্বার্থের শিকার; তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে পল্লীজীবনের অসহায় মানুষগুলির সুখ-দুঃখ-বেদনার চিত্র তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের কর্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যে-বাণী প্রকাশ করেছেন তা হয়ে উঠেছে সমস্ত দেশের অভাব ও ভাবনার উত্তর।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই জেনে নিয়েছেন পল্লীজননীর 'স্তন্যরস' শুকিয়ে গেছে, পল্লীর সঙ্গে শহরের মানুষের স্বার্থের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। যদিও 'অন্নের উৎপাদ হয় পল্লীতে' তবুও পল্লীবাসী খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বস্ত্র, চিকিৎসা সবকিছু থেকেই বঞ্চিত; তাই রবীন্দ্রনাথ শহর ও গ্রামের মধ্যে একটি মিলনসাধনায় প্রয়াসী হন, স্বার্থের দ্বন্দ্বকে স্তিমিত রাখতে। 'অর্থ-উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ সেখানেই কেন্দ্রীভূত স্বভাবত সেখানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা-কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহু লোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মানুষ; অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। ওই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশিদিন টিকতেই পারে না।'[৮৪] রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন পল্লীর সঙ্গে নগরের বৈষম্যতা আছে, যা শুধু সৃষ্টি হয়েছে ধনীর স্বার্থে, শহুরে মধ্যবিত্তের স্বার্থে; তাই শহরের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ যে, তাদেরকে এমন কোনও 'দুঃসাহসিক' কাজ করতে হবে না, বরং একটি পল্লীবাংলাকে 'বিনা যুদ্ধে' দখল করে নিলেই যথেষ্ট।[৮৫] কারণ, দেশের কল্যাণ যারা চান তাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে– পল্লীবাসীর আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে দিয়ে পল্লীজীবনকে সংগঠিত করা। অন্যদিকে তিনি দেখেছেন, পল্লীর 'শ্রীবৃদ্ধিসাধন' করতে, 'ইহকালের সুবিধা উপলক্ষে', যে-লোকগুলি কাজ করতে পারত তারা 'শহরে শহরে দূরে দূরে' ছড়িয়ে আছে।[৮৬] ধনের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের চালনাশক্তির ক্ষেত্রে, সুযোগসুবিধা বণ্টনের ক্ষেত্রে শহরজীবনের ও পল্লীজীবনের স্বার্থ আলাদা; এই বৈষম্যতাকে দূর করতে তিনি বলেছেন, 'একদিন ছিল যখন পল্লীবাসী, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণ, কেবল যে দেশের ধনের ভাগী ছিল তা নয়, দেশের বিদ্যাও তারা পেয়েছে নানা প্রণালী দিয়ে। এরা ধর্মকে শ্রদ্ধা করেছে, অন্যায় করতে ভয় পেয়েছে, পরস্পরের প্রতি সামাজিক কর্তব্যসাধনের দায়িত্ব স্বীকার করেছে।

[৭৯] পল্লীপ্রকৃতি, সম্ভাষণ, শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৮০] পল্লীপ্রকৃতি, সম্ভাষণ, শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৮১] পল্লীপ্রকৃতি, সম্ভাষণ, শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৮২] পল্লীপ্রকৃতি, সম্ভাষণ, শান্তিনিকেতনে সম্মিলিত রবিবাসরের সদস্যদের প্রতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৮৩] পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীর উন্নতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৮৪] পল্লীপ্রকৃতি, উপেক্ষিত পল্লী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৮৫] পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীর উন্নতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৮৬] পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীর উন্নতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেশের জ্ঞান ও ধর্মের সাধনা ছিল এদের সকলের মাঝখানে, এদের সকলকে নিয়ে। সেই দেওয়া-নেওয়ার সর্বব্যপী সম্বন্ধ আজ শিথিল।'[৮৭]

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই উপলব্ধি করেছেন যে, পল্লীজীবন গঠনকাজে শহরের মানুষ যদি উদ্যোগ আরম্ভ করে তবে ঐক্যবন্ধন হতে কতক্ষণ, এবং যদি সঠিকভাবে ঐক্যবন্ধন সৃষ্টি হতে পারে তবে দেশের কল্যাণ হতে কতক্ষণ! কারণ, শহরজীবনের সহযোগিতা পেলে পল্লীজীবনও বহু উঁচুতে আসন পেতে পারে, যেখানে স্বার্থের ভেদ, শ্রেণীর ভেদ, উঁচু-নিচুর ভেদ, ছোট-বড়োর ভেদ অসত্য হয়ে যাবে, আর তখন ভেদভুলে দেশের সমগ্র মানুষ প্রকৃত মুক্তির পথের সন্ধান পাবে, যা হচ্ছে সত্যিকার স্বাধীনতা, এবং এই স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজন পড়ে বিজ্ঞানের, কারণ 'বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে'[৮৮]; তাই রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাংলার আনাচে কানাচে পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, 'মানুষের শক্তির এ-নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই'[৮৯]।

বাঙালির প্রাণকেন্দ্র পল্লীবাংলার পিছিয়ে পড়া মানুষের দুঃখ, দুর্দশা দৃষ্টে রবীন্দ্রনাথের দরদী অন্তর বিচলিত হয়ে ওঠে। তাঁর দার্শনিক মন বাঙালি জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে যে নির্দেশ দেয় তা আজও সমভাবে প্রযোজ্য। পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী-এর সভাপতির অভিভাষণের কয়েকটি মূলতত্ত্ব এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন,

> প্রথম, বর্তমান কালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতে হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি— জোট বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, অর্গ্যানিজেশ্যন। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।
>
> দ্বিতীয়, আমাদের (স্বাধীনতা সংগ্রামের) চেতনা জাতীয় কলেবরের সর্বত্র গিয়ে পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিতসমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।
>
> তৃতীয়, এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতেই পারে না। শিক্ষিতসমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্বত্র অবোধ সঞ্চারিত হইতে পারিবে।
>
> সর্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটা বৃহৎ কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিতসমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কখনো সম্ভবপর হইবে না। মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয়, কিন্তু দূরের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্কসভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনই একই কর্মের দুর্গম পথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে না। যদি থাকে তবে বুঝিতে হইবে, দেশের যে সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না, অথবা ঐ সাংঘাতিক দশার যেটি সর্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ— নৈরাশ্যের ঔদাসীন্য— তাহা আমাদিগকেও দুরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।
>
> ভ্রাতৃগণ, জগতের যে-সমস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব; যে-সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনার দ্বারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব; তাহা হইলেই অদ্য যে মহাসভায় সমগ্র বাংলাদেশের আকাঙ্খা আপন সফলতার জন্য দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম যর্থাথভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা সামান্য কথাটুকুর কলহে আত্মবিস্মৃত হইতে কতক্ষণ। নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়তো উদ্দেশ্যের পথে কাঁটা দিয়া উঠিবে, এবং দলের অভিমানকেই কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিব।
>
> আমরা এক-এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইব। কোথায় থাকিবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা মান-অভিমান তর্ক-বিতর্ক বিরোধ! কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অদ্যকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করো যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, এ-সমস্তই আমাদের, এ-সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্মল

[৮৭] পল্লীপ্রকৃতি, উপেক্ষিতা পল্লী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৮৮] পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীর উন্নতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৮৯] পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীর উন্নতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

> করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্জীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে— আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ, এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে-ধর্মে-কর্মে প্রতিষ্ঠিত বীর্যে-বিধৃত জাতীয় সমাজ, এ আমাদের কীর্তি। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সমস্তই আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্তপদভারে কম্পমান।[৯০]

উপরিদ্ধৃতি থেকে যুগশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। এক কথায় মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর ছিল ধী-সম্পন্ন পদচারণা। অনন্য অসাধারণ বহুমুখী বাঙালি প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথকে বিশদভাবে আলোচনা করা কখনই সম্ভব না, তবু স্বীকার করতে হয়, বাঙালির উন্নতির অন্তরায়কে তিনি সুচিহ্নিত করে রেখে গেছেন। 'পরলোকের দিকে ক্রমাগত দৃষ্টি দিয়ে কতখানি শক্তির অপচয় হয়েছে তা বলা যায় না। বহু শতাব্দী ধরে আমাদের এ দুর্বলতা চলে আসছে। এর শাস্তি, ইহলোকের বিধাতা সে শাস্তি আমাদের দিয়েছেন। জাতিভেদ, ধর্মভেদ, মূঢ় সংস্কারের আবর্তে যতদিন আমরা চালিত হতে থাকব ততদিন কার সাধ্য আমাদের মুক্তি দেয়।'[৯১]

[৯০] সমূহ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩১৪।
[৯১] রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২৭, পৃষ্ঠা ২৯১।

একতারা

আমার ছুটি আসছে কাছে সকল ছুটির শেষ
ছবি একটা জাগছে মনে– ছুটির মহাদেশ ।
আকাশ আছে স্তব্ধ সেথায়, একটা সুরের ধারা
অসীম নীরবতার কানে বাজাচ্ছে একতারা ।[৯২]

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় 'বাউলতত্ত্ব'-এর বাস্তবসত্যটি উপলব্ধি করে অবহেলিত পল্লীজীবনের সীমাবদ্ধ নিরক্ষর বাউলকে একটি বিশেষ মর্যদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন । বাউলের একতারা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বলেই ত তিনি তাঁর বিখ্যাত 'গোরা' উপন্যাসে, বিনয় চরিত্রের মাধ্যমে, তাঁর মনের ইচ্ছাপূরণের জন্য বাউলকে ডেকে এনে 'অচিন পাখি'র গানটি শুনেছিলেন । নবীন বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'অচিন পাখি'র গানটি শুনেছিলেন বাউলের একতারায় ।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবন থেকেই বাউল সঙ্গীতের ভাব ও ভাষার প্রতি গভীরভাবে উদ্দাম-উল্লাসে অনুরণিত হয়েছেন, যা তাঁর জীবনব্যাপী উন্মুক্ত মনেমগজে, চেতনায় সুদৃঢ় প্রভাব ফেলেছে । বাউলের গান শুনে ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের আবেগে রবীন্দ্রনাথ আপ্লুত হয়েছেন, তাই তিনি বিশ্বাস করেছেন বাঙালির ভাব ও বাঙালির ভাষা আয়ত্ত করতে হলে বাঙালি 'যেখানে হৃদয়ের কথা' বলে সেখানে অনুসন্ধান করতে হবে, এতে '[...] যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে ।'[৯৩] জ্যোর্তিময় নাড়ীর আকষর্ণ, মানুষের সমস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা, সমস্ত অর্জনবর্জন, জগতের রহস্যাগারের মধ্যশক্তি, মহাসমুদ্রের বিজ্ঞান, সমস্ত আনন্দ, সত্যরূপ– এসবই খুঁজে পেয়েছেন বাউলের মাঝে রবীন্দ্রনাথ । 'এমন কোনো কোনো কবির কথা শুনা গিয়াছে, যাঁহারা জীবনের প্রারম্ভ ভাগে পরের অনুকরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন [...] অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি শুনিলে মনে হয় যেন তাহা কোনো একটা বাঁধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না । অবশেষে এইরূপ লিখিতে লিখিতে, চারিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে, সহসা নিজের যেখানে মর্মস্থান, সেইখানটি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন । আর তাঁহার বিনাশ নাই । এবার তিনি যে গান গাহিলেন তাহা শুনিয়াই আমরা কহিলাম, বাঃ, এ কী শনিলাম! এ কে গাহিল! এ কী রাগিণী!'[৯৪]

রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বাস, উদ্বেল হয়ে উঠেছেন উপেক্ষিত বাউলসঙ্গীতের স্বীকরণ-শিহরণে । গ্রামবাংলার জীবনে 'পরিপুষ্টিরই উপকরণ' জুগিয়ে বৈচিত্র্যের যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও রসসৌন্দর্যের বিস্তার হয়েছে তার নিপুণ সার্থক রূপই হচ্ছে বাউলের একতারা– বাউলসঙ্গীত; রবীন্দ্রনাথ নিজের সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এর সুরছন্দ প্রয়োগ করেছেন । রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন যে, বাউলসঙ্গীতের রসই বাঙালি জাতির জীবনে নূতনের আহ্বান, যা 'জরার আক্রমণ' থেকে সুস্থ করে তুলে মানবকে, যোগ স্থাপন করে দেয় মানবকে স্রষ্টার সঙ্গে, কারণ 'রসসৌন্দর্যই মানবচিত্তে আধ্যত্মিক পূর্ণতায় বিকাশিত হয়'[৯৫] । ভারতবর্ষীয় রাগসঙ্গীত ও পাশ্চাত্ত্যসঙ্গীতের প্রভাব কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণার উৎস খুঁজে পেয়েছেন বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র বাউলের একতারায়– বাউলসঙ্গীতে । যদিও একদিন 'আমাদের' সঙ্গীত রাজসভায়, সম্রাট্সভায় 'পোষ্যপুত্রের মতো আদরে' বাড়ছিল, কিন্তু এখন সেসব সভা আর নেই, সেরকম হওয়ার অবকাশও নেই, তাই সঙ্গীতের সেই যত্ন-আদর, সেই হৃষ্টপুষ্টতা চলে গেছে, কিন্তু বাউলসঙ্গীতের মার কখনও হওয়ার নেই; কারণ এ-সঙ্গীত যে-রসে 'লালিত' সে-ধারা অজীবনই চলবে । মূলকথা 'প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড়ো শিল্পও টিকিতে পারে না ।'[৯৬]

[৯২] সেঁজুতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৯৩] বাউল-গান, সংগীতচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৯৪] বাউলের গান, সমালোচনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৯৫] অভিভাষণ, সংগীতসংঘ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
[৯৬] সংগীতের মুক্তি, সংগীতচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বাঙালির সঙ্গীত– বাউলসঙ্গীত– রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রবণ হৃদয়কে আপ্লুত করেছে, যে ভাবের ভাষা অনুবাদ করা অসম্ভব, সে আর যাই হোক তা বাঙালির হৃদয়জাত, বাংলা ছাড়া আর কোথায় একে খুঁজে পাওয়া যায় না; সংস্কৃত, ইংরেজি ভাষা যতই উল্টোপাল্টো করা হোক না কেন এর সন্ধান শুধু বাঙালির হৃদয়েই মিলে। 'নদীমাতৃক বাংলা দেশের প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে যেমন ছোট-বড়ো নদী-নালা স্রোতের জাল বিছিয়ে দিয়েছে, তেমনি বয়েছিল গানের স্রোত নানা ধারায়। বাঙালির হৃদয়ে সে রসের দৌত্য করেছে নানা রূপ ধরে। যাত্রা, পাচালি, কথকতা, কবির গান, কীর্তন মুখরিত করে রেখেছিল সমস্ত দেশকে।'[৯৭] রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে, সঙ্গীতের এত বৈচিত্র্য আর-কোনও দেশে আছে কিনা তা তিনি জানেন না।[৯৮]

বাউলের প্রতি আকর্ষণ যে শুধু তাঁর উপন্যাসে প্রভাব বিস্তার করেছে তা নয়, সচেতনভাবে বাউলের সঙ্গীতের মূল্যায়ন প্রয়াসও তাঁর প্রবন্ধে দেখা যায়। সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা চিন্তাভাবনা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে বিধৃত হলেও ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'সংগীত ও ভাব' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে বলেছেন, '[...] বঙ্গসমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এমনকি, সে আন্দোলনের এক-একটা তরঙ্গ য়ুরোপের উপকূলে গিয়া পৌঁছাইতেছে। এখন হাজার চেষ্টা করো-না, হাজার কোলাহল করো-না কেন, এ তরঙ্গ রোধ করে কাহার সাধ্য! এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সংগীতের নব অভ্যুদয় হইয়াছে।'[৯৯]

বাউলসঙ্গীতের সন্ধান করতেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ, মোগল আমলীয় সঙ্গীতচর্চার অবসানের পর ব্রিটিশের আগমনে নাগরিক এবং নগর প্রভাবিত সমাজে সঙ্গীতের যে নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি সঙ্গীতকে জীবন্ত করার জন্যে আহ্বান করেছেন, 'আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর-অভ্যাস ও রাগরাগিণী-শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগরাগিণীর ভাব-শিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক। [...] আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোনো দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগরাগিণী রচনা করা হইত, যখন আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগরাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সে দিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না!'[১০০]

রবীন্দ্রনাথ ১২৮৮ বঙ্গাব্দে 'সংগীতের উৎপত্তি এবং উপযোগিতা'র বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যা হাভার্ট স্পেন্সারের 'দি অরিজিন এ্যাণ্ড ফানক্শন অফ মিওজিক'-এর অনেকটুকু অনুসরণ, এতে বলেছেন, 'আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়-স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত নিজের উত্তেজনা-প্রকাশের উপায় ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়।'[১০১] '[...] আপাতত মনে হয় যেন সংগীত শুনিয়া যে অব্যবহিত সুখ হয়, তাহাই সাধন করা সংগীতের কার্য। কিন্তু সচরাচর দেখা যায়, যাহাতে আমরা অব্যবহিত সুখ পাই তাহাই তাহার চরম ফল নহে। আহার করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তির সুখ হয় কিন্তু তাহার চরম ফল শরীর-পোষণ, মাতা স্নেহের বশবর্তী হইয়া আত্মসুখসাধনের জন্য যাহা করেন তাহাতে সন্তানের মঙ্গলসাধন হয়, যশের সুখ পাইবার জন্য আমরা যাহা করি তাহাতে সমাজের নানা কার্য সম্পন্ন হয়– ইত্যাদি। সংগীতে কি কেবল আমোদমাত্রই হয়? অলক্ষিত কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয় না?'[১০২] '[...] সংগীত কেবল চিত্তবিনোদনের উপকরণ নয়; তা আমাদের মনে সুর বেঁধে দেয়, জীবনকে একটা অভাবনীয় সৌন্দর্য দান করে।'[১০৩]

বিশ্বভারতী ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-ভাবনার বিষয়ে একটি প্রবন্ধগ্রন্থ প্রকাশ করে, এ-গ্রন্থে সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অনুভূতির কথাই সর্বত্র প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের স্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন বলেই 'বাউল' সংস্কৃতির ধারাগুলিকে তিনি সযত্নে ধারণ করেছেন তাঁর সঙ্গীতে। অতএব বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথকে যারা বলেন পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারা নিয়ে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তারা একটি ভুল ধারণা নিয়ে বসবাস করছেন।

[৯৭] শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, সংগীতচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৯৮] শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান, সংগীতচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[৯৯] সংগীত ও ভাব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১০০] সংগীত ও ভাব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১০১] সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা, সংগীত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১০২] সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা, সংগীত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১০৩] অভিভাষণ (সংগীতসংঘ), সংগীতচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাস্তবে তিনি নিজের জন্মভূমির মাটিতে দৃঢ়ভাবে শেকড় গেড়ে, সমগ্র জাতির একটি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের আলোহাওয়ায় গড়ে ওঠা সঙ্গীতের আওতায় সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্বকীয় সঙ্গীত জগৎটিকে। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নাড়ীবাঁধা বাউলসঙ্গীতের সন্ধান করতে গিয়ে অন্বেষণ-অনুপ্রবেশ করেছেন যেমনি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এ তেমনি তেরো শতকের চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রমুখের সৃষ্টি জগতে।

রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় একবার তাঁর পিতার সঙ্গে বোটে করে গঙ্গাভ্রমণে গিয়ে তাঁর পিতার বইগুলির মধ্যে একটি খুবই পুরনো, বাংলা অক্ষরে ছাপা, ফোর্ট উইলিয়াম থেকে প্রকাশিত 'গীতগোবিন্দ'-এর সন্ধান পান। ছন্দ অনুসারে তার পদের ভাগ ছিল না, গদ্যের মত এক লাইনের সঙ্গে আর-এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন সংস্কৃত জানতেন না, কিন্তু বাংলা ভালো জানতেন বলেই অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝতে পেরেছেন। এই 'গীতগোবিন্দ'টি কতবার যে পড়েছিলেন তা তিনি নিজেই বলতে পারেননি। জয়দেব কী বলতে চেয়েছেন তা রবীন্দ্রনাথ বুঝতে না-পারলেও, এর ছন্দে ও কথায় তাঁর মনের মধ্যে যা গাঁথা হয় তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসামান্য ছিল।[১০৪]

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অন্বেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা জানতে পেরেছেন সে-সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। [...] যিনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি হইয়াছেন তিনি সহজ কথার কবি, সহজ ভাবের কবি। [...] অতএব সহজ ভাষার, সহজ ভাবের, সহজ কবিতা লেখাই শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়। সকলের প্রাণের মধ্যেই যে ব্যক্তি আতিথ্য পায়— ফুল বলো, মেঘ বলো, দুঃখী বলো, সুখী বলো, সকলের প্রাণের মধ্যেই যাহার আসন আছে, সেই তাহা পারে। [...] আমাদের চণ্ডিদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে-সকল কবিতা লেখেন নাই তাহারই জন্য কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন। [...] বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহ্য করিবার কবি! চণ্ডিদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডিদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন।'[১০৫]

ষোল শতকের সূচনায় শ্রীচৈতন্যের আর্বিভাবের সঙ্গে কীর্তনাঙ্গের গানের সমৃদ্ধি হয়, সেজন্য শ্রীচৈতন্যকে এ-ধারারই প্রতিনিধি বলা যায়, কারণ 'যাহাদের বড়ো প্রাণ তাহারা বেশি দিন নিজের মধ্যে বন্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। চৈতন্যদেব ইহার প্রমাণ।'[১০৬] আঠারো শতকের কালী-উপাসক রামপ্রসাদের গানে ও বিভিন্ন ভজনের মধ্যে পাওয়া যায় 'বাউল' ঐতিহ্যের সন্ধান ও 'বাউল' সাধনার মূলমন্ত্রটি। বাউলসঙ্গীত বাংলাদেশের প্রাচীন লোক ও ধর্মীয় সঙ্গীতের একটি বিশেষ ধারা, মুক্তপুরুষ লালনও ত এই বিশেষ ধারার একজন। মুক্তপুরুষ লালনের মুক্ত দৃষ্টি-চিন্তা-চেতনা রবীন্দ্রনাথ অনুসন্ধান করেছেন, করেছেন বলেই তাঁর সৃষ্টিতে আত্মশুদ্ধির বাউল ভাবটিকে খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে তিনি মুক্তপুরুষ লালনের সামগ্রীক মুক্ত দৃষ্টি-চিন্তা-চেতনায় এক ও অভিন্ন ভাবের সমারোহ ঘটিয়েছেন, যা একেবারেই একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল-গোষ্ঠী-গোত্রের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বঙ্গীয় 'বাউলতত্ত্ব', আর যা গৌড়ীয় 'বৈষ্ণবতত্ত্ব' ও পারস্যের 'সূফীতত্ত্ব' থেকে পৃথক।

১৮৯১ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিলাইদহে, তখন বাউলদের সঙ্গে তাঁর সবসময় দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত।[১০৭] ঘণ্টার পর ঘণ্টা। 'তারা গরীব। পোষাক-পরিচ্ছদ নেই। দেখলে বোঝাবার জো নেই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজ ভাবে তারা বলতে পারত।'[১০৮] বাংলাদেশের বাউলসঙ্গীতই রবীন্দ্রনাথকে সর্বাপেক্ষা আন্দোলিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ '[...] একদল প্রেমিক সাধকদের সঙ্গ পেলেন শিলাইদহের পল্লী অঞ্চলে। যারা আজকে বাংলাদেশে বাউল নামে বিখ্যাত। এরা একটা বিশেষ সম্প্রদায়। সংখ্যার দিক থেকে এ সম্প্রদায়ের অতি সামান্যই তখনো পর্যন্ত বর্তমান। এতে হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল। তবু ধর্মে এরা না হিন্দু না মুসলমান। এদের অধ্যাত্ম জীবন

[১০৪] জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১০৫] চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১০৬] বাউলের গান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১০৭] বাউল-গান, সংগীতচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১০৮] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ।

গড়ে উঠলো এই দুই ধর্মের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে। এরা প্রেমের সাধক। অজানা অচেনা কায়াহীন বিশেষ এক প্রেমের বস্তুকে ভালবেসেই এদের আনন্দ।'[১০৯] শিলাইদহে যাওয়া-আসার পথে এবং পরবর্তীকালে জমিদারীর দায়িত্ব পালনের সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, চর্যাগীতি থেকে শুরু করে একটি নির্দিষ্ট ধারা বয়ে চলেছে বাঙালির সঙ্গীতচিন্তায়। 'এত দিন তিনি পরের বাঁশি ধার করিয়া নিজের গান গাইতেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণের সকল সুর কুলাইত না। তিনি ভাবিয়া পাইতেন না— যাহা বাজাইতে চাহি তাহা বাজে না কেন! সেটা যে বাঁশির দোষ! ব্যাকুল হইয়া চারি দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা দেখিলেন তাঁহার প্রাণের মধ্যেই একটা বাদ্য আছে। বাজাইতে গিয়া উল্লাসে নাচিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "এ কী হইল। আমার গান পরের গানের মতো শোনায় না কেন? এত দিন পরে আমার প্রাণের সকল সুরগুলি বাজিয়া উঠিল কী করিয়া? আমি যে কথা বলিব মনে করি সেই কথাই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে!'[১১০]

বাঙালির নিজস্ব ধ্যানধারণার সঙ্গে খুব সহজভাবেই মিশে আছে সূফী, গজল প্রভৃতি পারসি সঙ্গীতের প্রভাব। রবীন্দ্রনাথের পারসি সূফীসঙ্গীত ধারণা অবশ্য জন্মলাভ করেছে তাঁর পিতার সান্নিধ্যে এসে, তাঁর পিতা পারসি সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন, হাফিজ ও ওমর খৈয়াম প্রমুখ কবিদের রচনাবলী ছিল তাঁর নিত্য দিনের সঙ্গী; তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পারসি সাহিত্য এবং সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে অনুরাগ সৃষ্টি হয় তার কারণ তাঁর পিতৃপ্রভাব। তিনি পারসি সূফীসাহিত্য এবং সূফীসঙ্গীতের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করেছেন মধ্যযুগীয় সাধক কবি কবীরের পদে, তাই ত রবীন্দ্রনাথ অনূদিত কবীরের কিছু গানে 'বাউরা'র (হিন্দিতে বাউলকে 'বাউরা' বলা হয়ে থাকে) অনুভূতির কথা শোনা যায়। কবীর বাউল মতাদর্শী ছিলেন। কবীর ছিলেন 'লোক' নামে কথিত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। তাঁর গানে মানবতার যে উদ্বোধন, রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বাউলের 'মনের মানুষ', 'সে মনের মানুষ অন্য সব দেবদেবীর মতো কোন শক্তির প্রতীক নন। তিনি মানুষের বাস্তব জীবনের ভালোমন্দ কিছুই করেন না। তিনি আছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে গোপনে। সেই গোপনবাসী মনের মানুষের খবর প্রেমের সাধনায় তারা পান। কিন্তু ধরতে পারেন না।'[১১১] তাই বাউলসঙ্গীতের ভাষায় সর্বদাই প্রকাশ পেয়েছে সেই অন্ত রবাসী মানুষকে জানা ও না জানার অসীম বেদনা। 'জীবনদেবতা' ও 'মনের মানুষের' মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পেয়েই রবীন্দ্রনাথ বাউল ও তাদের সাধনার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।[১১২] যেকোনও সাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর পাওয়া যায় বলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন না। আনুষ্ঠানিক ধর্মের বন্ধনমুক্ত বাউলের প্রতি রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়ে মত্ত হয়ে উঠেছেন তাদের আদর্শকে নিজস্ব আদর্শে মিলিয়ে নিতে। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে বাউলের আত্মদর্শন 'মানব-সত্য' আবিষ্কার করতে গিয়েই তিনি নিজেকে 'ব্রাত্য', 'মন্ত্রহীন', 'জাতিহারা' বলে পরিচয় করিয়ে দেন।

দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।
আমি কবি ওদের দলে
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।[১১৩]

বাউলসাধকদের 'মনের মানুষ' বারবার ও নানাভাবে 'জীবনদেবতা' হিশেবে প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতে। 'মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ; জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণের সত্য হই, সেই পরিমাণেই সেই মনের মানুষকে পাই– অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে মনের মধ্যে দেখতে পাইনে। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে, সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর ক'রে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। সেই বাহিরে বিক্ষিপ্ত আপন-হারা মানুষের বিলাপ গান একদিন শুনেছিলাম, পথিক ভিখারীর মুখে,/ আমি কোথায় পাব তারে,/ আমার মনের মানুষ যেরে।/ হারায়ে, সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে/ দেশে-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।/ সেই নিরক্ষর

[১০৯] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ।
[১১০] বাউলের গান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১১১] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ।
[১১২] রবীন্দ্রসঙ্গীতবিচিত্রা, শান্তিদেব ঘোষ।
[১১৩] পত্রপুট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলাম,–/ তোরই ভিতর অতল সাগর ।/ সেই পাগলই গেয়েছিল,–/ মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণণ ।'[১১৪] রবীন্দ্রনাথের এ-বক্তব্যে একজন নিরক্ষর বাউলের সুগভীর আত্মোপলব্ধির পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। সেজন্যই তিনি বাউলের বাণীর সন্ধান করতে পেয়েছেন; পেয়েছেন কোনও এক আপন জনের অভাবে হৃদয়ে যে গভীর বেদনা সৃষ্টি হয় তার সন্ধান করতে, যা তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিভিন্ন বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতে; বাউল প্রভাবের যথার্থতাই এখানে।

বঙ্গদেশে আধ্যাত্মবাদ সাধকজনের সৃষ্টিনিদর্শন অনেক। মূলত ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই সৃষ্টিকর্ম নানাভাবে, নানা নামে, নানা আখড়া-দরবারে প্রচলিত হয়ে আঠারো শতকে কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় এসে বটবৃক্ষরূপ ধারণ করেছে। মুক্তপুরুষ লালন তাঁর সাধনার রূপ-রস-গন্ধ সবই মানব জীবনের আমিত্ব ধ্বংসপ্রকরণের সাহচর্য হিশেবে এক অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম উপহার দিয়েছেন, যা বিগত আড়াই শতক ধরে এখন পর্যন্ত মানুষকে নাড়া দেয়। মুক্তপুরুষ লালনের পূর্বে বাউলসঙ্গীতের অস্তিত্ব, সংগ্রহ এবং সংকলন বাঙালি সমাজে থাকলেও মুক্তপুরুষ লালন ও তাঁর সমকালীন বাউলদের রচিত গানকেই বাউলসঙ্গীতের প্রাচীন ধারা বলে ধারণা করা হয়। বঙ্গীয় 'বাউলতত্ত্ব'-এর অন্যতম প্রবক্তাই ছিলেন মুক্তপুরুষ লালন। তাঁর মতবাদের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষুদ্র ধর্মমতের অনেকাংশে মিল এবং সাজুয্য থাকলেও লোকধর্মে সঙ্গীতই সাধনার অনুষঙ্গী। 'ভাবুক লোক মাত্রেই অনুভব করিয়াছেন যে, আমরা মাঝে মাঝে এক প্রকার বিষণ্ন সুখের ভাব উপভোগ করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রখর সুখ। তাহা আর কিছুই নয়, সীমা হইতে অসীমের প্রতি নেত্রপাত মাত্র।'[১১৫]

আধুনিক মানুষও মুক্তপুরুষ লালনের গানে আপ্লুত হয়, তবে এর চেয়েও বেশি আপ্লুত হয়েছেন উনিশ শতকে বিপুল চিন্তায় মগ্ন রবীন্দ্রনাথ। লালনের যে-গানটি প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল সেটি হচ্ছে, 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি/ কেমনে আসে যায়/ তারে ধরতে পারলে মনবেড়ী/ দিতাম পাখির পায় [...]।'[১১৬] সুকুমার সেন তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন, 'বাউল গানের এই পদটি কবিচিত্তে দীক্ষাবীজ বপন করিয়াছিল [...]।' আর শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'লালন ফকিরের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' এই জিজ্ঞাসার সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার গভীর মিল ছিল [...]।' রবীন্দ্রনাথ নিজেই লালনের 'অচিন পাখি' সম্বন্ধে লিখেছেন, 'মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির যাওয়া-আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।'[১১৭] রবীন্দ্রনাথ 'অচিন পাখি'র গানটির উল্লেখ করে ও এর সঙ্গে তিনি ইংরেজি কবি 'শেলী'র কবিতার তুলনা করে বলেছেন, '[...] That this unknown is the profoudest reality, though difficult of comprehension, is equally admitted by the English poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music vibrate the wing-beats of the unknown bird, only Shelley's utterance is for the cultural few, while the Baul Song is for the tillers of the soil, for the simple folk of our village households, who are never bored by its mystic transcendentalism [...] .'[118] বাউলসঙ্গীতের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ তাঁর অনেক সৃষ্টিনিদর্শনে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তাঁর অনেক সঙ্গীতে বাউলের সুর গ্রহণ করেছেন এবং রাগরাগিনীর সঙ্গে তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলসঙ্গীতের সুরের মিল ঘটিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায়, বাউলের সুর ও বাণী কোনও এক সময়ে তাঁর মনের মধ্যে সহজে মিশে গিয়েছে।[১১৯] মুক্তমানুষ লালনের অন্তরাত্মায় বাস করা সুসংহত 'বাউলতত্ত্ব' ও 'দর্শন' রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, এবং লালনসঙ্গীতের অভিচ্ছায়া তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে সুস্পষ্ট ছাপ ফেলেছে। একমুঠো উদাহরণ,

১. মুক্তপুরুষ লালন বলেছেন, 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে ।/ কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখবো চক্ষেতে ।' আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি/ কে আমারে– ও বন্ধু আমার/ না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা/ দিন যে আমার কাটে না রে ।' রবীন্দ্রনাথের গানটি লালনের গানের অনেকটাই

[১১৪] বাউলের গান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১১৫] বস্তগত ও ভাবগত কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১১৬] গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১১৭] গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[118] The Philosophy of Our People, 1925.
[১১৯] রবীন্দ্র রচনাবলী।

পুরিপূরক বলে সঙ্গীতাভিজ্ঞজন মনে করেন। এখানে লালনের দেহঘরের মুক্তিচাবি অপরের হাতে, আর অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তিদাতাকে আহ্বান করছেন সখারূপে।

২. মুক্তপুরুষ লালন বলছেন, 'আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।/ আমি জনম-ভর একদিন দেখলাম না রে।/ নড়ে চড়ে ঈশান কোণে দেখতে পাইনে এই নয়নে/ হাতের কাছে যার ভবের হাটবাজার/ আমি ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।' আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি/ তোমায় দেখতে আমি পাইনি।/ বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাইনি।' বাউল সাধনার মূল বিষয়টি হচ্ছে দেহতত্ত্বাত্ত্বিক। আপন দেহের ভেতর যে পরম পুরুষের বাস, তাঁকে না চিনলে সাধনা সিদ্ধি হয় না।

৩. মুক্তপুরুষ লালন বলছেন, 'যার আপন খবর আপনার হয় না।/ একবার আপনারে চিনতে পারলে রে/ যাবে অচিনারে চেনা।' এ-বাণীর মর্মার্থ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে লিখেছেন, 'আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।/ এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা।' নিজেকে চেনার মধ্যেই রয়েছে অচিন মানুষকে চেনার পরম প্রাপ্তি, অর্থাৎ প্রতিদিনের কর্মযোগের মধ্যেই রয়েছে নিজেকে চেনার বিরাটরকম চেষ্টা। এই চেষ্টা যদি সচেতনভাবে মানবজীবনে অনুশীলিত হতে থাকে তাহলেই একজন শুদ্ধ মানুষ হিশেবে সে অচেনার সন্ধান পাবে।

৪. মুক্তপুরুষ লালন বলেছেন, 'পার করো হে দয়ালচাঁদ আমারে [...]।' আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সমুখে শান্তিপারাবার ভাসাও তরণী হে কর্ণধার [...]।' লালনের গানের সঙ্গে যার ভাবগত আত্মিক মিল খুবই নিকটবর্তী।

৫. মুক্তপুরুষ লালন বলেছেন, 'আমার মনের মানুষেরই সনে মিলন হবে কতদিনে [...]।' আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার [...]।'

৬. মুক্তপুরুষ লালন বলেছেন, 'ঐ এক অজান মানুষ ফিরছে দেশে দেশে [...]।' আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সে যে বাহির হলো আমি জানি [...]।'

৭. মুক্তপুরুষ লালন বলেছেন, 'আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী/ ইতরপনা কার্য আমার অহর্নিশি [...]।' আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ' আমি কেবল তোমার দাসী/ কেমন করে আনবো মুখে তোমায় ভালবাসি [...]।'

৮. মুক্তপুরুষ লালন বলেছেন, 'কারে বলবো আমার মনের বেদনা/ এমন ব্যথার ব্যথিত মেলে না [...]।' আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইলো না কেহ [...]।'

৯. মুক্তপুরুষ লালন বলেছেন, 'কেন কাছের মানুষ ডাকছো শো'র করে/ আছিস তুই যেখানে, সেও সেখানে/ খুঁজে বেড়াও কারে [...]।' আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে/ তাই হেরি তায় সকলখানে [...]।'

এরকম অনেক উদাহরণ আছে, যাতে বিশেষ বিশেষ পদ, শব্দ, রূপক, প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্প, ভাব ও সুর কখনও আংশিক আবার কখনও বা পরোক্ষ উপায়ে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে একই ঐক্যতানে ফুটে উঠেছে। মুক্তপুরুষ লালনের মুক্তসত্তা রবীন্দ্রমানসে অনেকভাবে সম্পূরক হয়েছে, যা উভয়পুরুষের বোধীচেতনায় তাদের সৃষ্টিনিদর্শন অমর হয়ে আছে মানবজীবনের সকল গোত্র-বর্ণ-ধর্মের মানুষের কাছে। মুক্তপুরুষ লালনের আবির্ভাবের পরপরই কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার ও মীর মশাররফ হোসেন বেশকিছু বাউলসঙ্গীত রচনা করেছেন। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, আনন্দচন্দ্র মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অমৃতলাল বসু, অক্ষয় সরকার প্রমুখরা মুক্তপুরুষ লালন, পাগলা কানাই, পাঞ্জু শাহ, দুদ্দু শাহ প্রমুখের বাউলসঙ্গীত অনুকরণে গান রচনা করেন। বাউলসঙ্গীতের মাধ্যমে দীর্ঘকালের বাঙালি ঐতিহ্যের ধারায় বয়ে চলেছে মানুষের আত্মপ্রকাশের কর্মটি। সমস্ত সম্প্রদায়, সর্বধর্ম, জাতিবর্ণের সবরকম গণ্ডীর উর্ধ্বে বাউলসাধকরা। জীবনধারা তাদের সম্পূর্ণরূপে পৃথক– গানই তাঁদের সর্বস্ব, পথই তাঁদের আশ্রয়, একতারাই তাঁদের সঙ্গী। তাঁরা জীবনকর্মের মধ্য-দিয়ে গেয়ে চলেছেন সুমধুর মানুষের আত্মপ্রকাশের সেই গানগুলি। তাঁদের একমাত্র অভীপ্সা– বুক ঢেলে মানুষের

প্রাণেশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করা, কারণ তাঁরা মানবতার উন্মাদনায় মজে থাকেন। সামাজিক জীবনের গণ্ডি ছেড়ে এদের অনেকেই পথকে জেনে নিয়েছেন ঘর বলে, আবার দৈনন্দিন জীবনের মধ্যেই কেউ কেউ উপলব্ধি করেছেন মানবপ্রেমকে।

বাউল দ্বারাই ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে বাউলসঙ্গীতের। সরল-মধুর এ-গানগুলি গভীরভাবে অন্তরকে স্পর্শ করে; তাদের সলীল ছন্দের জন্যেই। এর রসেই অবগাহন করে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন তাঁর বাউলাঙ্গনের সঙ্গীত, বাউলসঙ্গীত থেকে পুষ্টি নিয়েই তিনি এর উপর ছাপ ফেলেছেন নিজের প্রবল ব্যক্তিত্বের। রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই বাউলসঙ্গীতের প্রতি তীব্র অনুরাগী হয়ে উঠেছেন। বরীন্দ্রনাথ তাই ত বলেছেন, '[...] বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে! এই সুরগুলিকে কোনো রাগকৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না– স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলাতি সুর নয়।'[১২০]

বঙ্গীয় 'বাউলতত্ত্ব' ছাড়াও গৌড়ীয় 'বৈষ্ণবতত্ত্বত্ত্ব' ও পারস্যের 'সূফীতত্ত্বত্ত্ব'-এর প্রভাবে বাংলায় কয়েক শতাব্দী ধরে যে-সঙ্গীত পুষ্টিলাভ করেছে, যা বৈচিত্র্যে অতুলনীয়, যাকে সহজে চিনে নেওয়া যায় একটি মূল সুর থেকে, একটি বিশেষ পরিবেশ থেকে, একটি বিশেষ ভাব থেকে– সেসবই স্থান করে নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতে; এখানে মুক্তির পথের সন্ধান মিলে– অবশ্য এতে দার্শনিকের যুক্তিতর্ক নেই– মানবকে ভালোবাসা, ভালোবাসা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; একইসঙ্গে নিজেকে মানবপ্রেমে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়। কারণ, 'যে মরে তার আর মরণের ভয় থাকে না। জগৎকে সে ভালোবাসে, এইজন্য সে জগৎ হইয়া যায়, সে একটা অতি ক্ষুদ্র 'আমি' মাত্র নহে, যে যমের ভয় করিবে— সে সমস্ত বিশ্বচরাচর। [...] ফুলকে জিজ্ঞাস করো না কেন, গন্ধ দান করিয়া তোমার লাভ কী? সে বলিবে, গন্ধ না দিয়া আমার থাকিবার জো নাই, তাহাই আমার ধর্ম! এইজন্য গন্ধ না দিতে পারিলে জীবন বৃথা মনে হয়। তেমনি প্রেমিক বলিবে মরণই আমার ধর্ম, না মরিয়া আমার সুখ নাই।/ লোভী লোভে গণিবে প্রমাদ,/ একের জন্য কি হয় আরের মরিতে সাধ।/ বাউল উত্তর করিল—/ যার যে ধর্ম সেই পাবে সেই কর্ম।/ প্রেমের মর্ম কি অপ্রেমিক পায়?'[১২১] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তনশীল এ-যে বিশ্ব, এ-যে জীবন একে সত্যানন্দের অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করাই ত মুক্তি। এ-যে উপলব্ধি, একই বলে বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া, মানবতার খাতিরে, সবকিছুর উপরে; আর তখনই বিশ্বাসাতীত মূর্ছনায় অন্তর ভরে ওঠে উষ্ণ এক নবানন্দের স্পর্শে, পরম প্রেমিকের সঙ্গীতের মাধ্যমে, কারণ 'প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমিষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে তুমি ভালোবাসো তাহার কাছে বসিয়া থাকো, অদৃশ্য প্রেমের তার দিয়া তাহার প্রাণ হইতে তোমার প্রাণে বিদ্যুৎ বহিতে থাকে, নিমেষে নিমেষে তাহার প্রাণের খবর তোমার প্রাণে আসিয়া পৌঁছায়। তেমনি যদি জগতের প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ প্রেমের তারে বাঁধা থাকে তাহা হইলে জগতের ঘরের কথা সমস্তই তুমি শুনিতে পাও। প্রেমের মহিমা এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে!'[১২২]

রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতকে বাউলসঙ্গীতের মতই শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। যেমন দৈন্যপদের ও প্রবর্তপদের সঙ্গীত। প্রথম পদের সঙ্গীতের আসরে বাউলসাধকরা সর্বপ্রথম তার গুরু, মুরশীদকে নিবেদন করে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন; এরকম রবীন্দ্রনাথও করেছেন, যেমন, 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।/ সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।'[১২৩]

দৈন্যপদের পরে আসে প্রবর্তপদের সঙ্গীত; তখন বাউলসাধকরা তাদের সাধনজীবনে 'মনের মানুষের' অন্বেষণ করার বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। বাউলের এমন আত্মতত্ত্বমূলক সঙ্গীতগুলি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রাণিত করেছে, তাই তিনি তাঁর 'পূজা', 'প্রকৃতি' পর্বের কিছু কিছু সঙ্গীতে অধ্যাত্মচেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, যেমন, 'আমি তারে খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।/ সে আছে বলে/ আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,/ প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।'[১২৪]

[১২০] সংগীতের মুক্তি, সংগীতচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১২১] বাউলের গান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১২২] বাউলের গান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১২৩] পূজা, গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১২৪] পূজা, গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এ-পর্যায়ের সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ বাউল ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে তিনি সুরকে কোনও স্বতন্ত্রভাবে দেখেননি। বাউলসঙ্গীতে তিনি বাংলা গানের সত্যিকার পরিচয় খুঁজে পেয়েছেন, তাই তো তিনি লক্ষ্য করেছেন এ-সঙ্গীত ভারতবর্ষীয় রাগসঙ্গীতের মত কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সুরের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং বাণী ও সুরের সম্মিলনে গঠিত। 'বাণী প্রতিটি বাঙালির অন্তরের টান; এই জন্যই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে ত মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না– এজন্যে বাংলাদেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পঙক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন। [...] কিন্তু সঙ্গীত যুগলভাবে গড়া– পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা। পদাবলীর মধ্যেই যেন তার রাসলীলা, স্বাতন্ত্র্য সে সইতে পারবে না।'[১২৫]

বাউলসঙ্গীত ছন্দোবহুল। বাউলসঙ্গীতের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে কথার ছন্দোবদ্ধ সহজ গতি; কারণ ভাবের আবেগে যখন বাউলসাধকরা নেচে উঠেন তখন যে-ছন্দের উন্মাদনা সৃষ্টি হয়, আপনা থেকে, সে-সহজ ছন্দটিকে লক্ষ্য করে তিনি সহজ ভাষা ও সুরের সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। 'যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই। সে কথা কহিয়া কী সুখীই হয়! তাহার এক-একটি কথা তাহার এক-একটি জীবিত সন্তান।'[১২৬] 'কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। [...] এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্বরতা। বাংলা দেশের গ্রামের গভীর বিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের আগোচরে আপনা-আপনি কিরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।'[১২৭] বাউলসঙ্গীতে ছয়-মাত্রার 'দাদ্‌রা' বা কখনও আট-মাত্রার 'কাহারবা' জাতীয় ছন্দের লক্ষণ দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এসব কারণেই তালের দিক থেকে তাঁর বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতে নূতন কিছু সৃষ্টি করার প্রয়োজন বোধ করেছেন। 'বাউল গানের সুরে আমরা দেখি দুটি ভাগ। সাধারণ নিয়মে এই গানের যত কলিই থাকুক না কেন, সুরে পার্থক্য দেখা যায় কেবল প্রথম কলির সঙ্গে দ্বিতীয় কলির। পরের আর সব কলির সুর দ্বিতীয় কলিকে অনুসরণ করে চলে, এবং প্রথম কলি ছাড়া অন্যান্য সব কলির ছন্দও এক।'[১২৮] রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে বাউলসঙ্গীতের ঢঙ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সীমা থেকে এই ভাবেই বড় ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতের সুরে আছে ধ্রুপদের মত চারটি অংশ– অস্থায়ী, অন্তরা ও সঞ্চারীতে সুরের বৈচিত্র্য ও আভোগ ঠিক ধ্রুপদের মত অন্তরাকে অনুসরণ করে।[১২৯] অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বারা পুষ্ট। বাউলের সঙ্গীতভাবনা, অনুশীলন এবং তাত্ত্বিক আলোচনা রবীন্দ্রনাথকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু সঙ্গীতের রূপায়ণ এবং তার কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধ্যানধারণা পরিস্ফুটিত।

রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতের সুরে যে ছাপ রেখেছেন তা সহজেই অন্তরে প্রবেশ করে, তবে বাউল তথা মুক্তপুরুষ লালন, পাঞ্জু শাহ প্রমুখের বাউলসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রসৃষ্ট বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতের সুরে অমিলটাই বেশি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাণীতে মিলন ঘটলেও গায়নশৈলীতে ভিন্নতা রয়েছে। বাউলসঙ্গীতের সুরকে কেউ কেউ উদাসী সুর বলে চিহ্নিত করে থাকলেও বাউলসাধকদের এই উদাসী ও আত্মনিমগ্নের ভাবটি রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে প্রচুর, তবুও হৃদয়ের ব্যথাকে প্রকাশ করতে যে-সুর আপন থেকে জেগে ওঠে তা রবীন্দ্রসৃষ্ট বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতের সুরে অনেকটা অনুপস্থিত। তাই সুরের ক্ষেত্রে নূতন আঙ্গিক বা ঢঙ চিহ্নিত হয় রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতে। তাল এবং মাত্রায়ও আছে পার্থক্য। বাউলসঙ্গীতে দুটি ঢঙয়ের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়: একটি আখড়াশ্রয়ী– যেখানে বাউলসঙ্গীতের সুর অনেকটা ধীর-লয়ে আত্মনিমগ্ন বাউলসাধকের কণ্ঠে ফুটে ওঠে, ফলে তাল ও মাত্রায় শান্ত নদীর একটি ছবি ফুটে ওঠে; আর অন্যটি জনসম্মুখাশ্রয়ী– যেখানে আত্মনিমগ্ন বাউলসাধকরা চড়া সুরে, দ্রুত তাল-লয়-মাত্রায় ও নৃত্যের মাধ্যমে বাউলসঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। 'বাউলের নাচে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাতেও বৈচিত্র্য অর্থাৎ তাল ফেরতা আছে। এই হিসেবে বাউল গান শুধু কানে শুনবার নয়, চোখে দেখবার বস্তু। বাউলের একতারা, নৃত্যের ভঙ্গি, ভাবের উচ্ছ্বাস, সবই

[১২৫] কথা ও সুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১২৬] বাউলের গান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১২৭] বাউল-গান, সংগীতচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১২৮] রবীন্দ্রসঙ্গীত, শান্তিদেব ঘোষ।
[১২৯] রবীন্দ্রসঙ্গীত, শান্তিদেব ঘোষ।

সামনে থেকে দেখে শুনে তবে বুঝতে হয়।'[১৩০] তবে আখড়াশ্রয়ী বাউলসঙ্গীতের সুরেই রবীন্দ্রনাথ প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। জনসম্মুখাশ্রয়ী বাউলসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের সঙ্গীতে এ-মিল ঘটেনি।

অধিকাংশ রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতে সঞ্চারির সুর তাঁর নবসৃষ্টি; বাউলদের সুরের গঠনপ্রণালীর সঙ্গে মিল রেখেই এগুলি তিনি তৈরি করেছেন, যদিও তাঁকে অনেক সময় প্রাচীন রাগরাগিণী বা কীর্তনের সুরের সাহায্য নিতে হয়েছে, তবুও বাউলসঙ্গীতের যা বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে সুর, এতেও রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যতা নিয়ে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতে রাগরাগিণী মিশে গেলেও বাউলসঙ্গীতের সুরের সঙ্গে তার একটি চমৎকার সামঞ্জস্য দেখা যায়, যেমন,

১. 'বজ্র মাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা' গানটির সঞ্চারিতে সন্ধান মিলে দেশ রাগিণীর রূপটি।
২. 'আমি তারেই জানি আমায় যেজন আপন জানে' গানটির সঞ্চারিতে স্থান পেয়েছে পিলু রাগিণীটি।
৩. 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও গো এবার যাবার আগে' গানটি রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পিলু রাগিণীটিও এতে মিশে আছে, তবুও ধ্রুপদের মত চারটি ভাগে এর সুর গঠিত হয়নি। 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও গো এবার যাবার আগে' গানটি আরম্ভ হয় বাউলসঙ্গীতের সুরে, কিন্তু কোনও সুনির্দিষ্টভাবে বা বিশেষভাবে বিভক্ত নয় বলে সুরযোজনায় কোনও বিঘ্ন ঘটেনি। বাউলসুর ও পিলু রাগিণী একের সঙ্গে অন্যটি মিলেমিশে আছে। গানের কথায় যেখানে যেভাবে সুর বসানো প্রয়োজন ঠিক সেভাবেই সুরগুলি স্থান করে নিয়েছে, অর্থাৎ গানের প্রথম অংশে বেদনার প্রকাশ, সুরটিও ঠিক সেই– বেদনার অনুকূল; আর শেষ অংশে যেখানে কথার সাহায্যে এক উন্মাদনার ভাব ফুটে ওঠে সেখানে সুরটিও সেই পথের পথিক।

রাগভিত্তিক রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতের আরও কয়েকটি উদাহরণ,

১. 'বাদল বাউল বাজায়রে একতারা' (খাম্বাজ রাগ ও সারির চার মাত্রায় কার্ফা তাল);
২. 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' (কালেংড়া রাগে ও বাউলের ত্রৈমাত্রিক দ্রুতলয়);
৩. 'বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই' (ভৈরবী রাগে ও বাউলের ত্রৈমাত্রিক দ্রুতলয়) প্রভৃতি।

এরকম আকর্ষণীয় সুর সৃষ্টির তাগিদে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্ররকম পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন, কারণ, 'রসবোধের নাড়ী যখন ক্ষীণ হয়ে আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়িয়ে যায়।'

রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান বিচিত্র্য; তিনি তাঁর কোনও কোনও সঙ্গীতে বাউল সাধনার কিছু কিছু প্রতীক শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাউলের 'রূপ-স্বরূপ' তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের অজনা ছিল না, তাই তিনি স্বীয় জীবনদর্শন প্রকাশের প্রয়োজনে এ শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন; প্রকৃত অর্থে– রবীন্দ্রনাথ বাউলই, তাই তাঁর বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতে সুরের অপেক্ষা বাণী প্রাধান্য পেয়েছে, অবশ্য এ-কুশলী প্রয়োগের জন্যে তাঁর বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতে অন্যরকম মাত্রাও পেয়েছে; অবশ্য এও অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর কিছু কিছু বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতে বাউলভাব অস্পষ্ট; যেমন, 'আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।/ আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে।'[১৩১] রবীন্দ্রনাথ এখানে সুরের পরিবর্তে ভাবকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, তিনি সুরকে নিজের মত করেই সাজিয়ে নিয়েছেন।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় মানবপ্রেম বা দিব্যপ্রেম– এ-দুটি বিষয়ে স্পষ্ট কোনও পার্থক্য আঁকেননি, বরং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মানবপ্রেমই গভীর ঐশী প্রেমের ছোঁয়া লেগে মহান-নির্মল হতে পারে; তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর স্বরচিত বাউলাঙ্গনের সঙ্গীত বাঙালির হৃদয়কে সবচেয়ে বেশি, নিবিড়ভাবে ছুঁয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গনের সঙ্গীতের অংশই হচ্ছে– মিশ্র-বাউল ঢঙ, প্রচলিত এবং নিজস্ব ঢঙের সারি, আখরযুক্ত এবং আখরহীন কীর্তন। একমুঠো উদাহরণ,

১. 'কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি' (মিশ্র-বাউল)।
২. 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' (মিশ্র-বাউল)।
৩. 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' (সারি)।

[১৩০] রবীন্দ্র-সঙ্গীত, ড. প্রিয়ব্রত চৌধুরী।
[১৩১] গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪. ‘এবার তোর মরা গাঙে’ (সারি) ।
৫. ‘তোমার খোলা হাওয়ায়’ (নিজস্ব ঢঙের সারি) ।
৬. ‘ওহে জীবন বলভ’ (আখরযুক্ত কীর্তন) ।
৭. ‘মাঝে মাঝে তব দেখা পাই’ (আখরযুক্ত কীর্তন) ।
৮. ‘না চাহিলে যারে পাওয়া যায়’ (আখরহীন কীর্তন) ।
৯. ‘আমরি না বলা বাণীর’ (আখরহীন কীর্তন) ।
১০.‘রোদন ভরা এ বসন্ত’ (আখরহীন কীর্তন); প্রভৃতি ।

বাউল ভাবনায় আপ্লুত হয়ে এবং ভাটিয়ালী ও সারি গানের সুর ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ বেশকিছু সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন, যেমন ‘নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে’ (ভাটিয়ালী); ‘আমার মন যখন জাগলি নারে’ (ভাটিয়ালী); ‘তোমার খোলা হাওয়া’ (ভাটিয়ালী); ‘খর বায়ু বয় বেগে’ (সারি); ‘এবার তোর মরা গাঙে’ (সারি); প্রভৃতি । রবীন্দ্রনাথ বাউলসঙ্গীতের অন্তরঙ্গরূপ দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন, বহিরাঙ্গের সঙ্গে নয়– অর্থাৎ বাউলসঙ্গীতের যা বৈশিষ্ট্য: বাউলসঙ্গীত পরিবেশেনে গায়কদের স্বাধীনতা, রবীন্দ্রনাথ তা গ্রহণ করেননি, এজন্যই রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের সঙ্গীতের জগৎটি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল; আবার বাউলসঙ্গীতের মতই বৈচিত্র্যহীন, ‘একঘেয়েমী’ । বাউলসঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের বাউলাঙ্গের সঙ্গীতে যে গভীর মিলটি লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে উভয় শ্রেণীর সঙ্গীতেই বিরহের সুরই প্রধান হয়ে উঠেছে, এ যেন বিরহ প্রেমস্পন্দনের মিলনজনিত বিরহ ।

বিশাল বাংলা আজ জাতিতে ও ধর্মে বিভক্ত । বিচ্ছিন্ন বাঙালি জাতির আজ এই সবচেয়ে বড় সমস্যা । বাঙালিকে এ-অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে বঙ্গীয় ‘বাউলতত্ত্ব’ সম্বন্ধে বিশদভাবে ও বলিষ্ঠভাবে গবেষণা করতে হবে । আর এরকম করতে পারলে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হবে । বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করে তারা বিশ্ববাসীর সামনে মহৎ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে । একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, বাঙালির দুঃখে-দৈন্যে, শোকে-সান্তনায়, বিরহে-মিলনে, বিদ্রোহে-বিপ্লবে, শিক্ষায়-সাধনায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়– বাঙালি জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাংলা মায়ের সেরা সন্তান রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে আছেন; ছড়িয়ে আছেন বাংলার একতারাতে; সুতরাং তাকে বিস্মৃত করার কোনও সুযোগ নেই । বাঙালির প্রয়োজনেই তাঁকে স্মরণ করতে হবে যতদিন বাঙালি নামের মানুষগুলি এই পৃথিবীতে ঐক্যবদ্ধভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজন উপলব্ধি করবে ।

উপসংহার

নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে
শুধাইছে দূর হতে চেয়ে,
'সন্ধ্যার তারার দিকে
বাহিয়া চলেছে তরণী কে।'
সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার—
মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয় [...]।[১৩২]

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শুভারম্ভে, প্রথম আলোর স্পর্শে যে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটেছে তা থেকে যেন তিনি বঞ্চিত না হন– এ ছিল তাঁর অন্তরের আকুতি। তাই ত রবীন্দ্রনাথ বাংলার নদী, মাটি, কীট, মানুষ, পল্লীবাংলা, একতারাকে– বাংলার রূপ ও স্বরূপকে– গভীর ভালোবাসা আর মমত্ববোধে নবরস ও রূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এসব প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে, কারণ তিনি যেমনি বাংলার আঙিনা থেকে কুঁড়িয়ে নিয়েছেন তাঁর চিন্তার ফসল, তেমনি বহির্জগতের আহ্বানকেও অমান্য করতে পারেননি।

জোয়ারবেলায়, কত রূপে-রঙে, কত নব নব উপাধিতে-নামে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের মাঝে পরিচিতি লাভ করেছেন। কৃত্তির বিজয়তিলক ললাটে ধারণ করে রবীন্দ্রনাথ কুঁড়িয়ে নিয়েছেন শ্রদ্ধা, ভালোবাসার অর্ঘ্য, সেসঙ্গে জন্মভূমি 'বাংলাদেশ'কে বিশ্বদরবারে পরিচয় করিয়ে দিতে কৃপণ ছিলেন না, বরং উপযুক্ত আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। ধন্য বঙ্গবাসী, গর্বিত বঙ্গজননী। তারপরও কৃতজ্ঞ অন্তরে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীকে ডাক দিয়েছেন, জননীর সেবায় নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে।

হে নূতন
হোক তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন।[১৩৩]

শেষজীবনেও বিশ্বের সুউচ্চ শিখরে অবস্থানকারী রবীন্দ্রনাথ শত পরিচয়ের মাঝে বেছে নিয়েছেন একটি পরিচয়— বাঙালি। ভারত উপমহাদেশের সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাঙালি' পরিচয়ে গর্ববোধ করেছেন, কিন্তু বাংলার একদল কটাই-মজুর, যদু-মধুর দল শিকড় খুঁজে বাংলার বাইরে, নিজেকে অবাঙালি বলে পরিচয় দেওয়ার জন্য কোনওরকম দাঁড় করাতে পারলে যেন তাদের বুক ফুলে ওঠে কামিনীর মত। তারা সুনিপুণ কলাকৌশল প্রয়োগে আত্মপ্রবঞ্চনায় নিজেদেরকে আদর্শ মানব হিশেবে কল্পনা করে, স্বপ্নে সৃজন করে আদর্শ সমাজও। পরিণতিতে তারা সত্তর হুরী-অপ্সরী পরিবেষ্টিত ও সতেরো গেলমান সেবারত পরিবেশে স্বর্গবাসের আরাম-আয়েশের কল্পিতস্বাদ চোখে এনে তৃপ্তি ধারণ করে। কিন্তু মাতৃভূমিকে পুণ্যস্থান বলে সম্মান করতে চায় না, করতে জানেও না, তাই তারা নিজেদের শিকড় সন্ধানে চলে যায় পরদেশে। এদেরই একদল ঠিকানা খুঁজে ইরান-তুরান-খোরাসান নয়ত-বা মুলতানে, তারা নিজেকে আশরাফ বলে ফলাও করে প্রকাশ করে, আর গোনাহ মোওকুফ করার জন্যে নিদেনপক্ষে খাজা বাবার দরগায় ধর্ণা দেয় বেয়াক্কেলের মত; আরেকদল পাপস্খলনের জন্য ছুটে যায় গয়া, কাশী; কুলীন হওয়ার বাসনায় কর্ণাটক। জাতি হিশেবে

[১৩২] সেঁজুতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১৩৩] সেঁজুতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাদের সবল কাণ্ডজ্ঞানের একান্ত অভাব। এ দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক দলের মানুষগুলোর যদি 'সবল কাণ্ডজ্ঞান' থাকত তবে যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বোধ হয় কোনওরকম কাজ চালিয়ে যেতে পারত, মানুষের কাতারে দাঁড়াতে পারত, কিন্তু হায়; এদের কারণেই অন্য জাতির তুলনায় বাঙালি আজ কোথায়?

বাংলার নদী, মাটি, কীট, মানুষ, পল্লীবাংলা, একতারাকে– বিচিত্র বাংলার রূপ ও রসকে– রবীন্দ্রনাথ যে কত ভালোবাসে ছিলেন তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত ত রয়েছে তাঁর সঙ্গীতে, কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, চিত্রে। এতসব দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও কেন সমগ্র বাঙালি জাতি 'বাঙালি' হিশেবে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিতে গর্ববোধ করে না? কেন তারা পারে না রবীন্দ্রনাথের মত বাংলাদেশকে ভালোবাসতে?

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহ মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে [...]।[১৩৪]

কেন ওরা বুঝে না যে, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালি। সকলই এক বিশাল বাংলার বেদনা অনুভব করতে পারে। ঘাতপ্রতিঘাত বা আঘাতের কারণে 'বাঙালি'র ঐক্যচেতনা থেকে দূরে সরে পড়ে গেলে বাঙালির মত দুর্ভাগা জাতি বা জনগোষ্ঠী এ-পৃথিবীতে আর থাকবে না। বর্তমানে বাঙালিজাতি খণ্ডে বিখণ্ডে বিভক্ত হয়ে নিজের জাতিগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, ঐতিহ্যগত ঐক্যচেতনাকে ভুলে গিয়ে বদ্ধপুকুরে পরিণত হয়েছে, নিজেদের মধ্যে অমিল খুঁজে বের করে দ্বন্দ্ব-সংঘষ সৃষ্টি করেছে। বিশাল বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে খণ্ডিত ইতিহাস নিয়ে মেতে উঠেছে। বাঙালি তাই ত বিশ্বের দরবারে ভিক্ষারী সেজেছে। পৃথিবীর দরিদ্রতম জাতি হিশেবে পরিচিতি লাভ করছে। বাঙালি জাতি আত্মভোলা তাই তাকে আবার শিকড়ের সন্ধান করতে হবে, গণ্ডিকে ভেঙে ঐক্যের আরাধনা-উপসনা-অর্চনা করতে হবে, তবেই তারা উন্নত-জাতি হিশেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করতে পারবে, উন্নতির সুপানই হচ্ছে এ-পথ।[১৩৫]

রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন একজন বাঙালি, সত্যসন্ধানী মহাপুরুষ, জীবনবাদী, যুগপৎ কবি। তিনি এক ক্রান্তদর্শী ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি দার্শনিক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষবিদ, ধর্মনিষ্ঠ শিল্পী। তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনের জগৎ সুগভীর ও সর্বত্রগামী– রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা কিছুই বাদ পড়েনি। ধর্মান্ধতা, বঞ্চনা, হীনতা, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখায় সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বরীন্দ্রনাথের সুগভীর সুতীব্র ভালোবাসার স্থান হচ্ছে বাংলার নদী, মাটি, কীট, মানুষ, পল্লীবাংলা, একতারা– অর্থাৎ বাংলার রূপ ও স্বরূপ। এ ভালোবাসা শুধু বিশাল বাংলাঞ্চলেই আবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে– সমগ্র মানবজাতির মাঝে। বঙ্গীয় 'বাউলতত্ত্ব'-এ আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন প্রবল মানবতাবাদ ও ন্যায়ের স্বপক্ষে সুগভীর আকাঙ্খা, তাই মানবপ্রেম অচেতনভাবে একীভূত হয়ে গেছে তাঁর ঈশ্বরপ্রেমেও। বাংলার প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পর সম্পৃক্তযুক্ত হয়ে আছে তাঁর সৃষ্টিনিদর্শনে, তাই ত তাঁর সৃষ্টিজগতে বারবার প্রকাশ পেয়েছে যে, মানবজীবনের যাবতীয় সম্পর্ক বিন্যাসে ও জাগতিক নিত্য কর্মধারার ভেতর দিয়েই নিজেকে উপলব্ধি করা, বাঙালিৈ হিশেবেই উপলব্ধি করা।

রবীন্দ্রনাথকে যতই জানার চেষ্টা করা হয় ততই সত্যিকার বাঙালির– আত্মায়, চেতনায়, জ্ঞানে– বিকাশ ঘটবে, এতে অবশ্যই অন্ধভাবটা কেটে যাবে, ধীরেআস্তে বাঙালির সমস্ত বিরোধ সরে যাবে। কাজের মধ্য-দিয়ে বাঙালি তার দাবীর অধিকার ব্যাপ্ত করতে সক্ষম হবে। বাঙালি মুক্তি পাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কুসংস্কার, শোষণ, অন্যায়, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা থেকে। ভীরুতা, পরাধীনতা ও মনুষ্যত্বহীনতার গ্লানি থেকে বাঙালি পাবে মুক্তির পথ। বাঙালি দেখাতে পাবে মানবতাবাদী লেখকশিল্পী রবীন্দ্রনাথের মনোভাব, যা তারা উন্মোচন, উদ্ঘাটন করে তাঁর বক্তব্য প্রকাশে উদ্গ্রীব হয়ে উঠবে। তখন বাঙালি সুস্পষ্ট বাক্যে বলতে পারবে,

হে নূতন
দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।

[১৩৪] স্ফুলিঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
[১৩৫] আত্মশক্তি, অবস্থা ও ব্যবস্থা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদঘাটন
সূর্যের মতন।
রিক্ততার বক্ষ ভেদী আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চির-বিস্ময়।
উদয়দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্তমাঝে
চির নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিলে বৈশাখ।[১৩৬]

রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বাস্তবায়ন করে বিশাল বাংলার মানুষ একটি সমৃদ্ধিশীল জাতি হিশেবে পরিগণিত হবে এবং 'চির নূতনেরে দিলো ডাক, পঁচিশে বৈশাখ'-এর মর্মবাণী উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন নবনূতনভাবে উদ্‌যাপন করবে— এই হোক সমগ্র বাঙালির সম্মিলিত কামনা ও উদ্দাম প্রচেষ্টা।

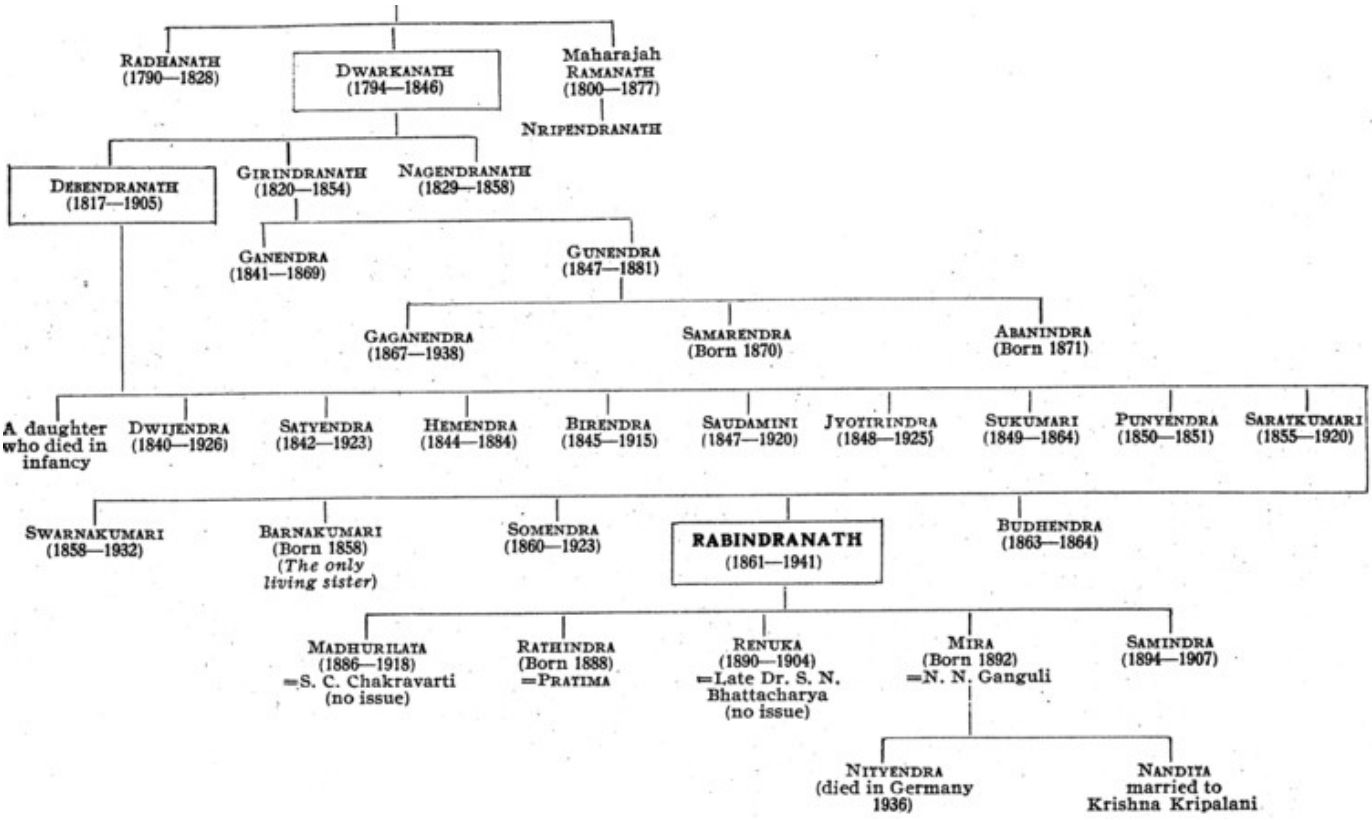

Rabindranath Tagore: family tree

[১৩৬] গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।